দশ কথা।

'দশে'র অনুপ্রাসের খাতিরে 'দশ কথা' নাম দিলাম,—এতটুকু বইয়ের ভূমিকা লিখিতে দশ কথা কোথায় পাইব!

বইখানির নাম **'দশ দিন'**; আয়তন **দশ** ফর্ম্মা; ছবি আছে **দশ** খানি; উৎসর্গ করিয়াছি **দশ** জনকে; মূল্য স্থির করিয়াছি **দশ** দুয়ানি;—তাই ভূমিকার নাম **দশ** কথা;—কথা কিন্তু অতি কম—বইখানিতেও কম, ভূমিকাতেও কম।

বইখানির জন্য আমি যাঁহাদের নিকট সহায়তা লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই নামোল্লেখ যথাস্থানে করিয়াছি। কিন্তু একজনের নাম উল্লেখ করিবার অবসর পাই নাই, তিনি শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই বইখানির আগাগোড়া ঠিক করিয়াছেন, ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, প্রুফ দেখিয়াছেন,—এবং এই নাবালক ঐতিহাসিক আমার পুস্তকের একজন প্রকৃত সমালোচক। শ্রীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয় বিনামূল্যে দশখানির মধ্যে আটখানি ব্লক প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; অবশিষ্ট দুইখানি ব্লক বর্দ্ধমানের মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দান করিয়াছেন। এখন, এই সকল মহোদয়ের নিকট যদি বর্ত্তমান ভদ্রতার হিসাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাই, তাহা হইলে তাঁহারা যষ্ঠি-হস্তে আমাকে তাড়া করিবেন; কারণ যাঁহাদের

নাম করিয়াছি, তাঁহাদের কাহারও সহিত আমার কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধ নাই ;—বর্দ্ধমানের মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমান হরিদাস সুধাংশু পর্য্যন্ত সকলেই আমাকে সাহায্য করিতে বাধ্য—আমি যে তাঁহাদেরই। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি না—আমি নামোল্লেখ করিলাম মাত্র।

পরিশেষে পাঠকপাঠিকাগণের নিকট একটী প্রার্থনা। অনেকেই ভূমিকায় বলেন 'পাঠকপাঠিকাগণ যদি পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলেই আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে।' আমি এমন কথা বলিতে পারিতেছি না ; আমি বলিব "এই কাগজের দুর্ভিক্ষ এবং ছাপাখানা ও দপ্তরীর অত্যধিক দাবীর দিনে আমার এই পুস্তক-প্রকাশের খরচ উঠিয়া গেলে (লাভ পরের কথা) আমার এই দশ কথা বলা সফল হইবে।" এখন এই পূজার বাজারে দশজনে যদি দশ-দশে এক-শখানি করিয়া কেনেন, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

কলিকাতা }
ভাদ্র, ১৩২৩ }

শ্রীজলধর সেন।

“কোথায় কৈলাসভূমি, কোথায় আমি বা আজি।
কোথায় বালুকাস্তূপ, বন বৃক্ষ লতারাজি॥
কোথায় যমুনারাণী, কোথা ‘জয় শিব’ ধ্বনি,
উঠে যে মধুর বাণী শত-নর-কণ্ঠে সাজি।
কোথায় আমার গুহা, যথা নাহি দ্বেষ স্পৃহা,
যথা উঠে ঊর্দ্ধে সদা প্রণবের ভেরী বাজি॥”

—বিজয়ানন্দ।



বিজয়ানন্দ বিহার

দশদিন

ছুটী

অমর কবি মধুসূদন লিখিয়াছেন—

——"রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

কথাটা আমি বিগত পূজার পর সার্থক করিয়াছি,—দীন আমি "রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দূর তীর্থ দরশনে" গিয়াছিলাম। নানা তীর্থে যাই নাই; দুইটি তীর্থে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দুইটিই ভারতের সর্ব্ব-প্রধান তীর্থস্থান;—এক শ্রীশ্রীকাশীধাম—হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান তীর্থ; আর এক আগরা—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান তীর্থস্থান। একটি ভক্তির তীর্থ, আর একটি প্রেমের তীর্থ; এক তীর্থে ত্রিলোকপাবন, বিঘ্নবিনাশন, ভোলানাথ, বিশ্বনাথ;—আর এক তীর্থে প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী তাজমহল! দুই-ই সমান,—দুই-ই অনন্তের পথ দেখাইয়া দেয়;—দুই-ই পাপতাপক্লিষ্ট, ব্যথিত, অভিশপ্ত হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করে। বারাণসীতে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে দাঁড়াইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া 'বাবা বিশ্বনাথ' বলিয়া ডাকিলে যেমন হৃদয় শীতল হয়,—সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা

মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইয়া যায়,—সব যেন ধুইয়া মুছিয়া যায়; তেমনই আগরা-তলবাহিনী যমুনার তীরে চন্দ্রমাশালিনী যামিনীতে জ্যোৎস্না-স্নাত তাজের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া একবার একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে—একবার সেই প্রেমে গঠিত সৌধের দিকে চাহিলে হৃদয়ের সব মলিনতা কোথায় চলিয়া যায়;—প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়; প্রেমের সেই লোক-মনোহর পার্থিব দেবমূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত হয়;—আর তখন অতি দীন, অতি হীনের অবনত-মস্তকে সেই পরম প্রেমময় দেবতার চরণ-স্পর্শ অনুভূত হয়! ক্ষণেকের জন্য জীবন ধন্য হইয়া যায়;—মনে হয়, কতযুগের কত পুণ্যফলে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি,—কত সুকৃতির ফলে ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি,—কত সাধনার বলে 'আমার বারাণসী' 'আমার বাবা বিশ্বনাথ' 'আমার তাজমহল' বলিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। বল—"আনন্দ হয়!"

আমি দশদিনের জন্য এই দুই আনন্দ-নিকেতন দর্শনের ছুটী পাইয়াছিলাম। এখন আর ছুটী মিলে না—মিলিবার যো নাই। যখন-তখনই ত ছুটী পাইয়া ছুটিতে ইচ্ছা করে—উধাও হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে; ইচ্ছা করে—

"উড়ে যাই বিমানের পথে—
শীতল বাতাস লাগুক গায়।"

কিন্তু তা হয় কৈ! পদদ্বয় লৌহ—কেহ বলিবেন—স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। লৌহ-নির্ম্মিতই হউক, আর স্বর্ণ-নির্ম্মিত, মরকত-

খচিতই হউক—শৃঙ্খল ত!—গতিশক্তি রোধ করে ত! দুই দিনের ছুটী করিতে গেলে চারিদিক হইতে দশ-পনরখানি বাগ্রহস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া কতকগুলি কণ্ঠ একস্বরে চীৎকার করিয়া বলে—"ওগো, কর কি? কোথায় যাও?"

ছুটী পাওয়া বড়ই দুর্ঘট! কতবার ছুটিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে;—জীবনে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে—তবুও ছুটীর সময় হয় নাই;—কবিশ্রেষ্ঠ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের বেদনা-কাতর, অশ্রুপ্লাবিত ভাষায়, হৃদয়ের সকল তন্ত্রী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, করুণকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"এখনও যদি হয় নি সময়,
আর কি সময় হবে—
ঘনায়ে আসিল মৃত্যুলগন
মিলন-লগ্ন কবে?
এত দিবসের এত তপস্যা
ব্যর্থই যদি হয়,
জীবন-শেষের নিমেষেও যদি
নয়নে অশ্রু বয়;
চিরদিবসের দেবতা আমার,
জীবন-বন্ধু মোর—
এমন করিয়া জীবন ভরিয়া
কে চাবে করুণা তোর!"

দশদিন

কতবার চেষ্টা করিয়াও যে ছুটী মিলে নাই, বিগত পূজার পর (১৩২২, ৫ই কার্ত্তিক; ২২এ অক্টোবর ১৯১৫) পূর্ণিমা তিথিতে, কেমন করিয়া সে শুভ-সংযোগ হইল ঠিক বলিতে পারি না। সেই বহুদিনের ঈপ্সিত ছুটী মিলিল—একেবারে **দশ-দিনের** ছুটী। বল—'**আনন্দ হর!**'

সকলেই প্রতিবৎসর পূজার অবকাশে, আফিসের বন্ধে, নানা-স্থানে যায়। আমার ত পূজাও নাই, অবকাশও নাই, আফিসের বন্ধও নাই। আমার আফিস বার-মাস, তিনশত-পঁয়ষট্টি দিনই খোলা। এক আফিস যদি বা বন্ধ হয়, আর এক আফিসের দ্বার আর বন্ধ হইতে জানে না—বন্ধ হইতে চায় না। সকলে আফিস বন্ধ পাইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে যায়,—'শীতল বাতাস' গায়ে লাগাইতে যায়;—আমি এক আফিসের দ্বার কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করিয়া, আর এক চিরদিনের খোলা-আফিসের চির-মুলতবী কাজের দপ্তর মাথায় বহিয়া, প্রবাস-নগরী ত্যাগ করিয়া, আমার ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, মৃত্যুকাতর, জনবিরল পল্লীভবনে যাই। এমনই করিয়া কত পূজা আসিল, কত পূজা গেল!

এবারও তাহাই স্থির করিয়াছিলাম। পূজার দুই তিন দিন পূর্ব্বে আলিপুরের 'বিজয়-মঞ্জিলে' বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহা-দুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। নানা কথার পর তিনি বলি-লেন, 'তা হ'লে বাড়ী যাওয়াই স্থির করলেন।' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞা হাঁ, আমার ত ছুটী নেই।' তিনি বলিলেন 'দশদিনের

ছুটীই হোক না। চলুন, পূর্ণিমার দিন দুইজনে কৈলাসে যাই।'

অন্য সময় হইলে ইতস্ততঃ করিতাম; তখন কি জানি কেন, আর ইতস্ততঃ করিলাম না; অমনি বলিয়া ফেলিলাম, 'বেশ, তাই হবে—আমার দশদিনের ছুটী।' বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আদেশ করিলেন, সুতরাং তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে—তাহা নহে; মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনেক আদেশ প্রতিপালন না করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছি। সে ভয় তাঁহার নিকট আমার ছিল না—এখনও নাই। মহারাজের আদেশ নহে—বন্ধুর অনুরোধও নহে—আত্মীয়ের আগ্রহও নহে,—অথচ এই সবই; এবং আরও কিছু। এক-পথের যাত্রীর নিমন্ত্রণ—আহ্বান! ইহারই জন্য দশদিনের ছুটী মিলিল। কে মিলাইল জানি না, কিন্তু মিলিল। 'ভারতবর্ষের' স্বত্বাধিকারী শ্রীমান হরিদাস ও শ্রীমান সুধা ভায়াদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর গ্রহণ করিলাম না;—কাজকর্ম্মের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিবারও প্রয়োজন মনে করিলাম না;—কোন দ্বিধাই করিলাম না। শ্রীমান হরিদাস ও সুধা ভায়াদ্বয় নিশ্চয়ই অমত করিবেন না; স্নেহের জোরেই ছুটী মিলিবে। তাহাই হইল; শ্রীমানদ্বয় সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন; 'ভারতবর্ষের' গুরুভার **দশদিনের** জন্য আমার স্কন্ধ হইতে নামিয়া আমার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবার ব্যবস্থা হইল। উপেন্দ্র দাদাও সানন্দে স্বীকৃত হইলেন।

বর্দ্ধমানে

ছুটী যখন স্থির হইয়া গেল, তখন স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে দেশে পাঠাইয়া আমি একাকী পূজার কয়দিন কলিকাতায় কাটাইলাম; কাজকর্ম্মের একটা ব্যবস্থা ত করিয়া যাইতে হইবে—**দশ দিনের** জন্য ত নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।

দেখিতে দেখিতে যাত্রার পূর্ব্বদিন আসিয়া পড়িল। আমি আলিপুরে যাইয়া শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটু নূতন রকম ব্যবস্থা করিলাম। স্থির হইল যে, আমি পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালের গাড়ীতে বর্দ্ধমানে যাইব। সেখানে সমস্ত দিন থাকিয়া রাত্রি এগারটার সময় ষ্টেশনে মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সহিত মিলিত হইব। আমার এ ব্যবস্থা করিবার একটি বিশেষ কারণ ছিল; তাহা এইস্থানে বলিতেছি।

বর্দ্ধমান-গমনের আমার প্রধান আকর্ষণ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর; কিন্তু তিনি যখন বর্দ্ধমানে অনুপস্থিত, তখন আমি সেখানে যাই কেন? বর্দ্ধমানে আমার আরও একটি আকর্ষণ আছে; তাহা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নবপ্রতিষ্ঠিত দেবস্থান—**'বিজয়ানন্দ-বিহার।'**

এই বিহার যে কি সুন্দর, কি পবিত্র স্থান, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। সে দেবস্থানের, সে 'বিজয়ানন্দ-বিহারের' বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত ; আর সাধ্যায়ত্ত হইলেও আমি সে কার্য্যে অগ্রসর হইতাম না। যাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয় ; যাহার প্রত্যেক মন্দির, প্রত্যেক স্থান নির্ম্মাতার ধ্যানলব্ধ, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে তেমনই ধ্যান-পরায়ণ হইতে হয়, তদ্‌ভাবের ভাবুক হইতে হয়। আমাতে সে ভাবের কণামাত্রও নাই। আমি কেন বৃথা শব্দাড়ম্বর করিয়া সে স্থানের, সেই অতুলনীয় দেবভবনের অবমাননা করিব ? বিশেষতঃ, আমি 'বিজয়ানন্দ-বিহারের' সবটা একসঙ্গে দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। যখনই বর্দ্ধমানে গিয়াছি, তখনই প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, সহস্রকার্য্য ত্যাগ করিয়া, ঝড়বৃষ্টি মেঘগর্জ্জন উপেক্ষা করিয়া, 'রমণার' শালবন অতিক্রম করিয়া 'বিজয়ানন্দ-বিহারে' উপস্থিত হইয়াছি ; এবং যেখানে হয় একস্থানে বসিয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবাদিদেবের আরতি দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। সুতরাং 'বিজয়ানন্দ-বিহার' তেমন করিয়া দর্শন কোন দিন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই,—এ জীবনে ঘটিবে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। এ অবস্থায় আমি সে দেব-নিকেতনের বর্ণনা কেমন করিয়া করিব ?

এই 'বিজয়ানন্দ-বিহারে' লক্ষ্মী-পূর্ণিমার সন্ধ্যা অতিবাহিত

করিবার জন্যই আমি বৰ্দ্ধমানে যাওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলাম; মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ইহাতে আপত্তি করিলেন না।

শুক্রবার দশটার গাড়ীতে আমি বর্দ্ধমানে গমন করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম; রাজা অনুপস্থিত, তাই রাজভবনে গেলাম না। তাহার পর অপরাহ্নকালে 'বিজয়ানন্দ-বিহারে' গমন করিলাম। সেখানে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়া, দেবাদিদেবের আরতি অনেকদিন পরে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং রাত্রি দশটার সময় প্রস্তুত হইয়া বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

যথাসময়ে পঞ্জাব মেল-গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের 'সেলুন' গাড়ী ট্রেণের পশ্চাদ্‌ভাগে সংলগ্ন ছিল। গাড়ী ষ্টেশনে আসিবামাত্র তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ষ্টেশনে উপস্থিত কর্ম্মচারীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীর দিকে গমন করিলাম। আমাদের জন্য একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলাম। মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতমোহন দাস, প্রধান চিকিৎসক শ্রীমান নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এবং চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ সেই কক্ষে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা আনন্দভরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পরই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

তীর্থপথে

কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, আমি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। সে অপকর্ম্ম আমি আর করিতে সম্মত নহি ; এবং তাহার জন্য নিজের অক্ষমতার কথা যথাযোগ্য বিনয়সহকারে নিবেদন করিবারও কোন প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। এই মাত্র বলিয়া রাখিতেছি, আমার এ 'দশদিন' ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে। তবে ইহা কি? তাহাও আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। লেখনী-কণ্ডুতি? হয় ত বা তাহাই! অথবা বৃদ্ধের প্রলাপ? হইতে পারে। যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, আমি কিছুই বলিতে পারিব না।

একে মেল ট্রেণ—এক এক রাজ্য অতিক্রম করিয়া তবে দম ফিরায় ; তাহার পর রিজার্ভ-টিকিটমারা ইলেকট্রিক-আলোকিত, ইলেকট্রিক-পাথাসংযুক্ত দ্বিতীয়শ্রেণীর গাড়ী; তাহার পর বেঞ্চজোড়া সুবিস্তৃত সুকোমল শয্যা ; তাহার পর শ্রীমান নন্দলাল-ললিতের আনন্দোচ্ছ্বাস। আরে রাম! ইহার নাম কি ভ্রমণ বলে? ভ্রমণ করিব—তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ;—বসিব এক বেঞ্চে পাঁচ জনের স্থানে এগারজন ;—প্রত্যেক ষ্টেশনে আরোহণেচ্ছু যাত্রীর সহিত রীতিমত বচসা করিব ; গাড়ীর দ্বারের হাতল টানিয়া ধরিয়া যাত্রীর বল পরীক্ষা করিব ; 'এ গাড়ীমে যায়গা নেহি, দুসরা গাড়ীমে যাও' বলিয়া-বলিয়া গলা শুকাইয়া ফেলিব ; আরোহণে

অকৃতকার্য্য, প্ল্যাটফরমস্থিত যাত্রীর সুমধুর বাক্যবর্ষণে এবং নূতন-নূতন সম্বন্ধ স্থাপনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিব; পাটের কলে পিষ্ট পাটের বাণ্ডিলের মত চাপা পড়িয়া বসিব,—আর ও কত কি করিব। তাহারই নাম ভ্রমণ! আর এ কি না, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, ইলেক্‌ট্রিক পাথার হাওয়া খাইতে-খাইতে নিদ্রার কোলে নিশ্চিন্তভাবে আত্ম-সমর্পণ! আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ইহার নাম ভ্রমণ বলে না;—ইহাকে গমন বল, অভিযান বল, আর যাহা খুসী তাহাই বল,—ভ্রমণ বলিও না। অতএব ইহা আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে—নহে—নহে। প্রমাণ—আমরা পরদিন সন্ধ্যার পর তণ্ডুলা ষ্টেশনে নামিয়া গাড়ী-বদল করিয়া আগরার গাড়ীতে উঠিলাম এবং রাত্রি নয়টার সময় আগরায় পৌঁছিয়া মহারাজার প্রাসাদে অর্দ্ধ-অতিথি হইলাম। 'অর্দ্ধ' কথাটার টীকা করিতে হইতেছে। আমি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের পূরা অতিথি; কিন্তু রাজ-প্রাসাদের অর্দ্ধ-অতিথি; কারণ আমার ভোজন রাজপ্রাসাদে হইত, কিন্তু আমার শয়নের জন্য রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে মহারাজা-ধিরাজ বাহাদুর একটি সাহেবের উদ্যানবাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন।

এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমার এ **দশদিন** ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে। আমার সোদরাধিক স্নেহভাজন, 'সাহিত্য'-সম্পাদক শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যখন-তখনই বলেন "দাদাকে একবার কোন্নগর ঘুরাইয়া আনিতে পারিলেই একখানি মাসিক-পত্রের ছয়মাসের খোরাক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।" সেই আমি

কোন্নগর নয়, বর্দ্ধমান নয়, দেওঘর-মধুপুর নয়,—একেবারে সেই অনেক দূর—সেই এক রাজার রাজ্য পার হইয়া, আর এক রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া আগরায় গমন করিলাম ; আর এই সুদীর্ঘ পথের কথা তিন চারি লাইনেই শেষ করিলাম। আমি যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেছি না, তাহার প্রমাণ ইহার অপেক্ষা আর অধিক সন্তোষজনক কি হইতে পারে ?

তবুও '**দশদিন**' লিখিব ; দশ কথাতেই লিখি, আর দশ-দশে একশত পাতেই লিখি,—আমাকে লিখিতেই হইতেছে। কেন ? কৈফিয়ৎ আপাততঃ মুলতবী থাকুক।

এখন কি লিখি ? ভাবিয়া দেখিলাম, আগরা এবং কাশীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় সে সম্বন্ধে আরও-না-হয়-ত শতাধিক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার যে কোন একখানি পড়িলেই সমস্ত বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়। তাহার জন্য আর আয়াস-স্বীকারের কোন প্রয়োজনই নাই। আমিও আগরা বা কাশীধামে তেমন করিয়া বেড়াই নাই, ঘুরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছাও হয় নাই।

এখন হয় ত কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন—'তবে এতদূর গিয়াছিলে কেন ?' আমি আগরায় গিয়াছিলাম তিনটি দৃশ্যের আকর্ষণে। তাহার মধ্যে প্রথম কৈলাস, দ্বিতীয় ফতেপুর সিক্রি এবং তৃতীয় তাজমহল। আমার এই পর্য্যায় দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি

তাজমহলকে সর্ব্বনিম্ন আসন প্রদান করিতেছি। আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি যে, এই তিনটির কেহই কাহারও অপেক্ষা কম নহে—সকলেই প্রথম—সকলেই শ্রেষ্ঠ!

তাজমহল

আগরার কথা যিনিই বলিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাগ্রে তাজমহলের কথাই বলিয়াছেন। মহাজনগণের প্রদর্শিত এ পন্থা আমিই ব অনুসরণ করিব না কেন? কিন্তু এই স্থানেই আমার বিপদ তাজমহলের বর্ণনা—সে ত আমার মত গন্ধ-মানুষের কর্ম্ম নহে আমি যাহাতে প্রতিদিন প্রতিরাত্রিতে তাজমহল দেখিতে পারি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন তিনি হয় ত মনে করিয়াছিলেন, আমি একেবারে তাজমহলের সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইব—আত্মহারা হইয়া যাইব; কি আমি যে সে উপাদানে নির্ম্মিত নহি। তাজমহল দেখিতে হইবে যে চক্ষু, যে হৃদয় লইয়া ঐ পবিত্র দেবমন্দিরের সম্মুখীন হইতে হয়, সে চক্ষু, সে হৃদয় আমার নাই। সুতরাং আমি সু দিবাভাগে হা করিয়া তাজের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াছি আর চন্দ্রমাশালিনী যামিনীতে সেই জ্যোৎস্নাস্নাত তাজমহলের পার্শ্বে বসিয়া ভাবিয়াছি,—এ কি একটা সৌধ, না আমার সম্মুখে একটা মহতী কল্পনার ছায়াবাজি। এ কি সত্যসত্যই একট

জড় কিছু, না আমার দৃষ্টিবিভ্রম! আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। রবিবার রাত্রিতে শ্রীমান ললিতমোহন আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ তাজের পার্শ্বে শয়ন করিয়া ছিলাম। রাত্রি অধিক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শ্রীমান আমাকে বলিলেন, "চলুন, যাওয়া যাক্।" আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "চল যাই।" তিনি বলিলেন, "এতক্ষণ কি দেখিলেন?" আমি বলিলাম "কিছুই না।" শ্রীমান ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি জেরা করিতে লাগিলেন। আমি অবশেষে হতাশ হইয়া বলিলাম "কি দেখিলাম, ঠিক বলিতে পারিতেছি না! আমার শুধু মনে হইতেছে, যাহা দেখিলাম তাহা—

"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

শ্রীমান্ আর কোন কথা বলিলেন না। আমরা নীরবে তাজমহল ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

আমার মনে হয়, বাঁশীর স্বরলহরোত্থিত অমূর্ত্ত রাগিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া—মর্ম্মরের রূপ ধরিয়া এখানে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। তন্দ্রালস রাগিণীর মূর্ত্ত চিত্র যদি দেখিতে চাও;—যদি দাম্পত্য-প্রেমের অবিনশ্বর কীর্ত্তি দেখিতে চাও—যদি দেখিতে চাও মোগলসম্রাট্ শাহ্‌জহানের জীবনের সুখ-স্মৃতি—যদি দেখিতে চাও প্রেমের কমনীয় মূর্ত্তি, তবে মোগলসম্রাট্‌দিগের লীলাস্থল আগরা নগরীর পাদদেশচুম্বী নীলসলিলা যমুনার তটে আসিয়া ভুবনবিশ্রুত সৌন্দর্য্যাধার এই তাজ একবার নয়ন ভরিয়া

চাহিয়া দেখ ;—চাহিয়া দেখ, সম্রাট্ শাহ্‌জহানের বড় সোহাগের, বড় সাধের স্মৃতির প্রতি। অদৃষ্টের পরিহাসে স্থবির সম্রাট্ যখন আপনার দুর্গমধ্যে আপনি বন্দী—পুত্রের অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবহারে যখন তিনি বেদনাহত, তখন তাঁহার শোকের একমাত্র শান্তিস্থল—তাঁহার সাধের স্বপন—ঐ সৌধ। বন্দী অবস্থায় দুর্গ হইতে ঐ সৌধের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি হৃদয়ে বল পাইতেন। মুমূর্ষু অবস্থায় কোন্ অজ্ঞাত, অজানা দেশে যাইবার পূর্ব্বে কবির ন্যায়, প্রেমিকের ন্যায়, সাধকের ন্যায় আপনার চিরবাঞ্ছিত—চিরসুন্দরের উদ্দেশ্যে দুই বিন্দু অশ্রু ফেলিয়া, এই সৌধের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভারত-সম্রাট্ জন্মের মত ধরাধাম হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। আর এই স্থানেই দয়িতার পার্শ্বে সম্রাট্ কবি, প্রেমিকবর, প্রেমমন্ত্রসাধক, —সংসারের দুঃখতাপ ভুলিয়া, শান্তিতে শয়ান আছেন।— আর এইখানেই—

"বঁধুর পরশে, ঘুমায় হরষে
মমতাজ সুন্দরী।"

যে লাবণ্যময়ী ললনার স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই প্রেমের মহাতীর্থে সৌন্দর্য্যের স্বপ্নস্বরূপ শ্বেতমর্ম্মরময় তাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহার জীবনকাহিনীর দুই একটি ঘটনা নীরস ইতিহাস হইলেও, আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। অর্জ্জুমন্দ বাণু বেগম ভারত-সম্রাজ্ঞী নুরজহানের ভ্রাতা আসফ্ খাঁর কন্যা। ১৬০৭

খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক খুর্‌রমের (পরে শাহ্‌জহান) সহিত জাহাঙ্গীর অর্জ্জুমন্দ বাণুর বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করেন। পাঁচবৎসর পরে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে এই বিবাহ সংঘটিত হয়। তখন খুর্‌রমের বয়ঃক্রম ২০ বৎসর তিন মাস—অর্জ্জুমন্দ তাঁহার অপেক্ষা একবৎসর দুই মাসের ছোট ছিলেন।

পিতা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্‌জহান সিংহাসন লাভ করেন। এই সময় হইতেই তিনি অর্জ্জুমন্দকে "মমতাজ মহল" নামে আখ্যাত করেন।

সত্য বটে, শাহ্‌জহান মমতাজের সহিত বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে এবং পাঁচ বৎসর পরে যথাক্রমে মুজাফর হুসেন মির্জ্জা ও শাহ নওয়াজ খাঁর কন্যার সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন; তথাপি এই দুইটি বিবাহের মূলে ভালবাসার নাম গন্ধ ছিল না—ইহা 'বা ইকৃতিজা-এ-মস্‌লিহেট' অর্থাৎ রাজনীতিক বিবাহ। শাহ্‌জহান মমতাজকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন—তাঁহার রূপ-গুণের তিনি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। মমতাজ তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। শাহ্‌জহান কি সুখে, কি দুঃখে, যখন যে অবস্থায় যেখানে গমন করিয়াছেন—মমতাজের সঙ্গ তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই।

নূরজহানের মোহিনী শক্তিতে চালিত হইয়া জাহাঙ্গীর যখন পুত্রকে একে একে তাঁহার সমস্ত জাগীর হইতে বঞ্চিত করেন, তখন শাহ্‌জহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'ন ও পরে আত্মরক্ষার্থ

এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন,—তখনও মমতাজ ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী।

উনবিংশ বৎসর বিবাহিত জীবনের ফলে, শাহ্‌জহানের ঔরসে মমতাজের গর্ভে ১৪টি পুত্রকন্যার জন্ম হয়; তন্মধ্যে চারিপুত্র, দারা (১৬১৫ খৃঃ), সুজা (১৬১৬ খৃঃ), আওরংজীব (১৬১৮ খৃঃ), মুরাদ (১৬২১ খৃঃ) এবং তিন কন্যা,—জঁহানারা বা বেগম-সাহেব (১৬১৪ খৃঃ), রোশনারা (১৬১৭ খৃঃ) এবং গহরারা (১৬৩১ খৃঃ) ব্যতীত অবশিষ্ট সন্তানগুলির অতি শৈশবেই মৃত্যু হয়।

ব্লকম্যান সাহেব 'আইন-ই-আকবরীতে' লিখিয়াছেন, মমতাজ সম্রাটের নিকট হইতে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন।

মমতাজের অদৃষ্টে সংসারের সুখভোগ বিধাতৃবিধানে অধিক-দিন স্থায়ী হয় নাই। শাহ্‌জহান যখন খাঁ জহান লোদীর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন, সেই সময় বুরহানপুরে রাজ্ঞী মমতাজের এক কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যা-প্রসবের কিয়ৎক্ষণ পরেই চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (৭ই জুন, ১৬৩১ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

কাসিম আলি আফ্রিদির "আত্মকাহিনী"তে লিখিত আছে :—"কনিষ্ঠা কন্যা দহর আরার (গহর আরা) জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে মমতাজ, গর্ভস্থিত সন্তানের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জীবনের আশা ত্যাগ করেন এবং অবিলম্বে সম্রাট্‌কে ডাকাইলেন। তিনি কাতরস্বরে

তাঁহাকে জানাইলেন,—'ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, সন্তান গর্ভাবস্থায় ক্রন্দন করিলে মাতা কখনও প্রসবের পর বাঁচে না। হে সম্রাট্! জীবনে যাহা কিছু অন্যায় বা দোষ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন— আমি এখন মরণপথের যাত্রী। অন্তিমকালে আপনার নিকট আমার দুইটি অনুরোধ আছে—প্রতিজ্ঞা করুন তাহা পালন করিবেন।' শাহ্‌জহান প্রতিশ্রুত হইলেন। মমতাজ বলিলেন, 'মঙ্গলময় খোদা আমার গর্ভে আপনার চারি পুত্র ও তিন কন্যা দিয়াছেন; ইহাদের দ্বারাই মোগলগৌরব ও বংশরক্ষা হইতে পারিবে। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা—আপনি আমার সমাধির উপর এমন একটি অবিনশ্বর কীর্ত্তিচিহ্ন সংস্থাপন করিবেন, যাহা জগতে অদ্বিতীয় হইবে।' মৃত্যুশয্যাশায়িনী পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া শাহ্‌জহান বাষ্পজড়িত কণ্ঠে উত্তরে বলিয়াছিলেন "রাজ্ঞী! তোমার অনুরোধ দুইটিই আমি রক্ষা করিব এবং তোমার এরূপ একটি সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিব, যাহা জগতে চিরদিন অতুলনীয় হইয়া থাকিবে।—আর সেই কীর্ত্তিচিহ্ন এরূপ স্থানে সংস্থাপিত করিব যে, প্রাসাদের সকল স্থান হইতে সকল সময়ে তোমাকে দেখিতে পাই।"

উপরিউক্ত ঘটনাবলীর কথা আগরায় এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক 'পাদিশানামা'-গ্রন্থকার আব্‌দুল হামিদ লাহোরী বেগমের মৃত্যুর কথা এইরূপ লিখিয়াছেন:— "যখন মমতাজ নিজের মৃত্যুসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হ'ন, তখন

তিনি কালবিলম্ব না করিয়া কন্যা জঁহানারা দ্বারা সম্রাট্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শাহ্‌জহান অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন। মমতাজ—মাতা ও পুত্রকন্যাদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।"

মমতাজের মৃত্যুতে সম্রাট্‌ এক সপ্তাহকাল কোন রাজকার্য্যে যোগদান করেন নাই। তিনি বলিতেন,—"রাজ্য-শাসনকে যদি আমি পবিত্র কর্ত্তব্যকার্য্যরূপে মনে না করিতাম, ইচ্ছামত যদি ইহা পরিত্যাগ করা যাইত, তাহা হইলে আমি ফকিরী লইতাম।"

রঙ্গীন পোষাক পরিধান, বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার—এমন কি বার্ষিক অভিষেক-উৎসব ও জন্মদিন-উৎসবে নৃত্যগীতও তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যখনই তিনি প্রিয়মহিষীর সমাধিস্থল দেখিতে গিয়াছেন, তখনই তাঁহার নয়ন বহিয়া অশ্রুনদী প্রবাহিত হইয়াছে।

বুরহানপুরের অপর পারে, তাপ্তিনদীতীরস্থ জৈনাবাদের উদ্যান-বাটিকায় প্রথমে মমতাজের মৃতদেহ রক্ষিত হয় (৭ই জুলাই, ১৬৩১ খৃঃ); পরে ডিসেম্বর মাসে তাহা শুজার তত্ত্বাবধানে আগরায় আনীত হয়।

মানসিংহের পৌত্র রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে আগরার এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড মমতাজের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ক্রয় করা হয়। নানা দেশের শিল্প-বিশারদগণের নিকট হইতে

সম্রাট্ তাজের নক্সা গ্রহণ করেন। পরে যে নক্সাটি মনোনীত হয়, তাহার একটি আদর্শ প্রথমে কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

মুকারম্মৎ খাঁ ও মীর আবদুল করীমের তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্ম্মিত হয়। 'দেওয়ান-ই-আফ্রিদিতে' উক্ত আছে, এই তাজের নির্ম্মাণকল্পে নয় কোটী সতরলক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। সিংহল, কন্দাহার, যোধপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে আনীত কুড়ি রকমের বিভিন্ন মূল্যবান্ প্রস্তর তাজমহল-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাজের নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হয় এবং ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শেষ হয়। অতঃপর নূতন সমাধি-মন্দির তাজমহলে মমতাজকে সমাহিত করা হয়।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী, মমতাজের দ্বাদশ-স্মৃতি-উৎসবে, শাহ্জহান যখন পত্নীর সমাধিমন্দিরে গমন করেন, সেই সময়ে তিনি একলক্ষ টাকার আয়যুক্ত আগরা ও নগরচিন পরগণার ত্রিশখানি গ্রাম তাজমহলের ব্যয়ভার বহনের জন্য উৎসর্গ করেন। অধিকন্তু, সমাধির নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত সরাই ও দোকানপসার ছিল, তাহা হইতেও যে একলক্ষ টাকা আয় হইত, তাহাও তাজমহলের জন্য ও সমাধিমন্দিরস্থ সাধুফকীরগণের ভরণপোষণে ব্যয়িত হইত।

শ্লিমান সাহেব যখন সস্ত্রীক তাজমহল পরিদর্শন করেন, সেই সময়ে তিনি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেন—"তাজমহল দেখিয়া

তোমার কিরূপ মনে হয়?" উত্তরে শ্লিমান-পত্নী বলিয়াছিলেন —"তাজ দেখিয়া কি মনে হয় তাহা বলিতে পারি না; তবে আমার মনে ইহাই উদয় হয় যে, আমার কবরের উপর যদি এইরূপ সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়, তবে আমি কালই মরিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি, আমি কেন, তাজ দেখিয়া অধিকাংশ রমণীর মনেই এই বাসনার উদয় হয়।"

শাহ্‌জহান মুমূর্ষু পত্নীর অন্তিম অনুরোধ উপেক্ষা করেন নাই। তিনি পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, জগতের সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম তাজ নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় তাঁহার প্রণয়িনীর দেহ সমাহিত করিয়া, স্বীয় প্রেম-প্রতিশ্রুতির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

বাহ্যসৌন্দর্য্যে তাজমহল অনবদ্য হইলেও, পবিত্র দাম্পত্য-অনুরাগের নিদর্শন বলিয়া, ইহার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে;—প্রেমের পবিত্রতীর্থ বলিয়া ভারতবাসীর ইহা বড় আদরের—বড় গর্ব্বের সামগ্রী।

তাজ দর্শন করিয়া কত জন কত কথা বলিয়াছেন; তাহার দুই চারিটি এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

An extract from Bayard Taylor's Introductory Remarks:—"* * * If there was nothing else in India, this would alone repay the journey.

The distant view of this matchless edifice satisfied me that its fame is well-deserved. So pure, so glorious did it appear, that I almost feared to approach it lest the charm should be broken. * * *"

আর আমাদের কবিসম্রাট্ সার রবীন্দ্রনাথ তাজমহল দর্শন করিয়া তাঁহার অমর লেখনীমুখে যে অমৃতধারা বর্ষিত করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কবিসম্রাট্ লিখিয়াছেন :—

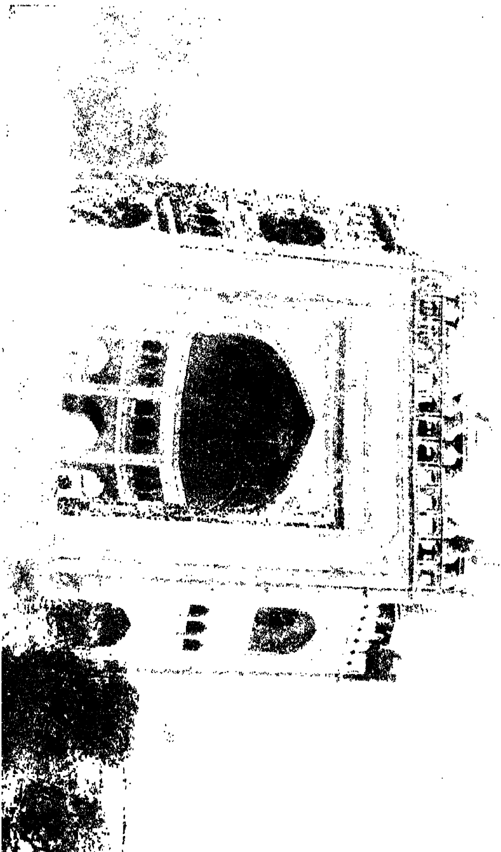
"হে সম্রাট্ কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ বিলাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,

ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগযুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

শনিবার রাত্রিতে আগরায় পৌঁছিয়াছিলাম। সমস্ত রবিবারটা তাজমহলের জন্যই রাখিয়া দিয়াছিলাম; প্রাতঃকালে তাজমহল,—মধ্যাহ্নে তাজমহল—অপরাহ্নকালে তাজমহল—রাত্রিতেও তাজমহল! সমস্ত দিনরাত ভরিয়া তাজমহল দেখিলাম; কিন্তু সে—

"——রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

—দেখিয়া আর আশ মিটিল না। প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী তাজমহলকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইলাম। পথে আসিতে আসিতে বারবারই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের লিখিত 'Passing of Shah Jahan'র নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে হইতে লাগিল—"Shah Jahan, retaining full consciousness to the last and gazing on the resting-place of his beloved and long-lost Mumtaz Mahal repeated the Muslim Confession of faith.-A moment later he



sank peacefully into eternal rest"—কি সুখের মরণ! তাজমহলের দিকে শেষদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে-করিতে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করা,— মনে করিলেও প্রাণের মধ্যে যে কি ভাবের সঞ্চার হয়, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

ফতেপুর সিক্‌রি

রবিবার রাত্রিতে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বলিলেন যে, পরদিন সোমবার প্রাতঃকালে আমার ফতেপুর সিক্‌রি দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেও দুই তিনবার আগরা গিয়াছি; কিন্তু একবারও ফতেপুর সিক্‌রি যাইবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই; যাঁহারা ফতেপুর দেখিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে উক্তস্থানের প্রশংসা করিয়াছেন।

আমার ভ্রমণের এই ব্যবস্থা হইল যে, খুব ভোরে আমার জন্য মোটর আসিবে;—এত ভোরে যে, আমরা আগরা হইতে যাত্রা করিয়া ২২ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক যেন ঠিক সাতটার সময় ফতেপুর সিক্‌রিতে পৌঁছিতে পারি। তথাস্তু! স্থির হইল যে, চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ আমার সঙ্গে যাইবেন; আর পথি-প্রদর্শক হইবেন মহারাজের একজন কর্ম্মচারী। এখানেই বলিয়া রাখি যে, মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যাঁহাকে আমাদের

'গাইড' করিয়া দিলেন, তিনি কিন্তু আমারই মত পণ্ডিত। তিনি কোন দিন ও-মুখোও হ'ন নাই। মহারাজ আদেশ করিলেন সুতরাং তিনি 'যো হুকুম' বলিয়া সেলাম করিয়া আমাদের পথিপ্রদর্শক হইলেন। পৃথিবীতে অনেক সময়েই এমন হইয়া থাকে; কর্ম্মজগতেই হউক আর ধর্ম্মজগতেই হউক, অনেক সময়েই অন্ধ কর্ত্তৃক অন্ধ নীয়মান হইয়া থাকে। যাক্ সে কথা।

পরদিন সোমবার সাড়ে পাঁচটার সময় মোটরচালক আসিয়া উপস্থিত হইল। 'আমরা তখনও শয্যাগত। মোটরচালক আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিল। তাহার নিকট শুনিলাম, একটু পূর্ব্বেই মহারাজ ঐ পথে বেড়াইতে যাইবার সময় আমাদের গৃহদ্বারে মোটর দণ্ডায়মান দেখিয়া চালককে 'জল্‌দি' করিবার জন্য আদেশ দিয়া গিয়াছেন। সংবাদটা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইলাম; মনে হইল 'যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়সির কাজ কামাই।' আমরা যাইব বেড়াইতে, আর তাহার জন্য ভোরের বেলা তাগাদা জুড়িয়া দিয়াছেন মহারাজা বাহাদুর।

তাড়াতাড়ি কোন প্রকারে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, বহুপূর্ব্বে আনীত চা পান করিয়া ফতেপুর সিক্‌রি যাত্রা করিলাম। বাইশ মাইল পথের মধ্যে যাহা যাহা দেখিলাম, তাহাদের দফাওয়ারি বিবরণ যদি সংগ্রহ করিয়া দিতে যাই, তাহা হইলে প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত হইবে। সে প্রলোভন আমি এই 'দশদিনে' পদে-পদে সংবরণ করিতেছি। কি ত্যাগ-স্বীকার! তবে ফতেপুর

সিকৃরিতে কি কি দেখিয়াছিলাম, তাহার একটা ছোটখাট বিবরণ দিতেছি। বলিয়া রাখা ভাল যে, এক্ষেত্রে আমাদের যিনি গাইড, তিনি আমারই মত অভিজ্ঞ, সুতরাং সিকৃরিতে পৌছিয়া যে ভাড়াটিয়া 'গাইড' পাইয়াছিলাম, সে যাহা-যাহা বলিয়াছিল এবং দেখাইয়াছিল, তাহাই বলিতে পারি। একটা কথা কিন্তু সকলেই মনে রাখিবেন যে, আমি ঐতিহাসিক নহি—প্রত্নতাত্ত্বিক ত নহি—নহি। সুতরাং আমি বাজার-প্রচলিত ইতিহাস হইতেই আমার কথা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। শেষে যে 'দশদিন' লেখা উপলক্ষে আমি ঐতিহাসিকগণের তীক্ষ্ণ লেখনীর আঘাতের বিষয়ীভূত হইব, তাহাতে আমি মোটেই রাজি নহি। কেতাবপত্রে ফতেপুর সিকৃরি সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, তাহারই সারসংগ্রহ করিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম আমার দ্বারা এমন দুষ্কর্ম্ম কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না,—একেবারেই অসম্ভব। তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিলাম।

ফতেপুর সিকৃরি সম্বন্ধে লিখিবার জন্য খানকয়েক ইংরাজী পুস্তক ওলটপালট করিতে-করিতে মনে হইল যে, বহুদিন পূর্ব্বে আমার সোদরপ্রতিম সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রে ফতেপুর সিকৃরি সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেইটি যদি আমি তুলিয়া দিই, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়;—আমি একরাশি বাজে বই (নবেল ছাড়া আর সবই আমাদের মত পণ্ডিতের নিকট বাজে বই) পড়া

এবং তাহার সারসংগ্রহ করার দায় হইতে অব্যাহতি পাই। সহৃদয় পাঠক এবং উদারহৃদয়া পাঠিকাগণ দেখিতে পাইতেছেন যে, আমি ইতিহাসের বোঝা কেমন করিয়া বন্ধুগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতেছি। পরে ইহার আরও প্রমাণ পাইবেন। এখন ফতেপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবাবু কি বলিয়াছেন, তাহা শুমুন; আর বোঝাপড়া করিতে হয়, তাঁহার সঙ্গে করুন; —আমি খালাস!

"বহু শতাব্দীর পলিপড়া প্রান্তরের মধ্যে দেড়শত ফিট উচ্চ বালুকাময় প্রস্তরের গিরিমালার উপর ফতেপুর সিক্‌রি অবস্থিত। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম পর্য্যন্ত ফতেপুর সিক্‌রি প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। এখানে রাজধানী নির্ম্মাণের ও পরিত্যাগের কারণ জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে। সে সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

আকবর শাহের সকল সন্তান শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি সপরিবারে আজমীরের প্রসিদ্ধ পীর মইনুদ্দীনের দরগায় গমন করেন। এই সুদীর্ঘ সাড়েতিন-শত মাইল পথ আকবর সপরিবারে পদব্রজে অতিক্রম করেন। প্রতিদিন তিন ক্রোশ পরিমাণ পথ অতিক্রান্ত হইত। বাদশাহের অসূর্য্যম্পশ্যা শুদ্ধান্তঃবাসিনীকে লোকচক্ষুর পাপদৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্য পথের উভয়পার্শ্বে কাণাৎ (পর্দা) সংস্থাপিত

হইয়াছিল; আর কঠিন ধরণীতলস্পর্শে বাদশাহের, ততোধিক বেগমের কোমল পদপল্লবতল ব্যথিত হয়, সেইজন্য সমস্ত পথ কোমল কার্পেটে মণ্ডিত হইয়াছিল। দিবসের ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, বাদশাহ ও বেগম যেখানে বিশ্রাম করিতেন, সেখানে একটি করিয়া ইষ্টকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইত।

দরগায় উপস্থিত হইয়া "হত্যা" দিলে রাত্রিকালে বাদশাহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে, তাঁহাকে সিক্‌রির ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গবাসী শেখ সেলিম চিস্তির নিকট যাইতে হইবে। এই আদেশানুসারে আকবর শাহ সেই ছিয়ানব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সাধু সেলিম চিস্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, সম্রাট্-মহিষী রাজা বিহারী মল্লের কন্যার গর্ভে আকবরের যে সন্তান জন্মিবে, সেই দীর্ঘজীবী হইবে। বেগম তখন গর্ভবতী; কাজেই তাঁহার সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত আকবর সপরিবারে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১এ আগষ্ট তারিখে মহিষী একটি পুত্র প্রসব করিলেন; রাজ্যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। সেই সাধুপুরুষের নামানুসারে, আকবর শাহ পুত্রের 'মির্জ্জা সেলিম' নামকরণ করিলেন। এই মির্জ্জা সেলিমই ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত।

তখন সর্ব্বদা সাধুর অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আশায়, আকবর নির্জ্জন সিক্‌রিতেই রাজধানী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। সাধুর নির্জ্জন বাসস্থান জনকোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল; সাধুর তপশ্চরণের

ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহার পর আকবর যখন সিকৃরিতে রীতিমত দুর্গ-নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন, তখন সাধু বলিলেন, "যদি আমার ক্ষমতায় তোমার আর বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার ও আমার একস্থানে বাস করা অসম্ভব। আমাকে এস্থান হইতে শান্তিতে বিদায় লইতে দাও।" এই কথা শুনিয়া আকবর বলিলেন, "তাহাই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে দাসকে অনুমতি করিলে দাসই অন্যত্র গমন করে।" তখন বৃদ্ধ সাধু আগরা সম্রাটের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

রাজাকে লইয়াই রাজধানী; রাজার বাসস্থান-পরিবর্ত্তনে পূর্ব্ব রাজধানী শ্রীহীন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সম্রাটের আদেশে আগরার জনহীন প্রান্তর অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল; আর বন্যার জলের মত জনস্রোত ফতেপুর সিকৃরি হইতে সরিয়া গেল। এখনও ফতেপুর সিকৃরিতে সমুন্নত সৌধ ও প্রশস্ত পথ তেমনই রহিয়াছে; নাই কেবল নগরের জীবন, সৌধের সৌন্দর্য্য,—মানব। এখন সে পথে আর মানব-পদধ্বনি শ্রুত হয় না, বোধ হয় যেন আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত মৃত নগর; যেন কুশ-পরিত্যক্তা অযোধ্যা—

"যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশায়,
মুখর নুপুর চারু বাজিত চরণে;
আপনার পথ হেরি মুখের উল্কায়
সে পথে শৃগাল ঘুরে আমিষান্বেষণে।

খোদিত রমণীমূর্ত্তি স্তম্ভের উপর
ধূলায় বিবর্ণ হ'য়ে রয়েছে এখন ;
রক্ত অসিচর্ম্ম পড়ি আছে বক্ষোপর
উরস আবরি যেন রয়েছে বসন।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ও আরও অনেকের মতে পানীয় জলের অভাবই আকবরের ফতেপুর ত্যাগের কারণ।

ফতেপুরের বিশেষ বিবরণ

দক্ষিণদিক দিয়া প্রবেশ করিতে প্রথমেই 'বুলন্দ দরওয়াজায়' দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফারগুসনের মতে, ভারতবর্ষে, সম্ভবতঃ জগতে, আর কুত্রাপি কোন ধর্ম্মমন্দিরের এমন মনোরম দ্বার নাই।

বুলন্দ-দ্বারের পার্শ্বে একটি প্রায় ত্রিশ ফিট গভীর স্বচ্ছসলিল সরোবর আছে। দর্শকদিগের নিকট হইতে কিছু বক্‌শিস লাভের আশায় বালকগণ ও যুবকদল প্রায় সত্তর ফিট উচ্চ মসজিদ হইতে সেই সরোবর-সলিলে লাফাইয়া পড়ে। বুলন্দ-দ্বারের উপর আরোহণ করিলে, পরিত্যক্ত নগরী ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রান্তরের দৃশ্য নয়ন-সমক্ষে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়।

দ্বার অতিক্রম করিয়া সুবৃহৎ চত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশে বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন একটি মসজিদ অবস্থিত। প্রাঙ্গণের অপর তিন পার্শ্বেই

তীর্থযাত্রীদিগের জন্য রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। মসজিদটি তিনটি শ্বেত-মর্ম্মর-নির্ম্মিত গম্বুজের মুকুটে মণ্ডিত। মসজিদের দুই পার্শ্বের অংশ যাত্রীনিবাসের ন্যায় রক্তপ্রস্তরে গঠিত। মসজিদের মধ্যাংশ খিলান করা ও হর্ম্ম্যতল নানা-প্রকার জ্যামিতির চিত্রের মত চিত্রিত, সুন্দরীকৃত। মসজিদের প্রধান খিলানে লিখিত খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বুলন্দ-দরওয়াজা ইহারও বহুদিন পরে (১৬০১ খৃঃ) নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদের পশ্চাতে শেখ সেলিম চিস্তির শিশুপুত্রের সমাধি ও জাহাঙ্গীরের সূতিকাগৃহ। এখানে বসিয়া বৃদ্ধ সাধু আপনার ছাত্রদিগকে শিক্ষা-দান করিতেন।

চত্বরের উত্তরাংশে দুইটি সমাধি অবস্থিত। একটি রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত, অপরটি অমল-ধবল মর্ম্মরে গঠিত। ইহার বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ধবল প্রস্তরময় দেহ দূর হইতে সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যবহুল চিক্কণ বস্ত্রখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয়। এই সমাধিটি শেখ সেলিম চিস্তির। এই সমাধি-মন্দিরাভ্যন্তরে শুক্তি-খচিত মর্ম্মর-আচ্ছাদনতলে তাঁহার দেহাবশেষ প্রোথিত। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে এই সমাধি-নির্ম্মাণ শেষ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এই মন্দির নানা বহুমূল্য প্রস্তরে সুশোভিত ছিল। জাঠগণ সেই রত্নরাজী লুণ্ঠন করিয়া মন্দির শ্রীহীন করিয়া যায়। অপর সমাধিটি সেলিমের

পৌত্র—জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী ইস্‌লাম খাঁর। অপর সমাধিটির সহিত তুলনায় ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে।

চত্বরের পূর্ব্বাংশে ষাটফিট উচ্চ বাদশাহী দ্বারপথে বাহির হইয়া সোপানাবলি অতিক্রম করিলে, আবুল ফজলের ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজীর সুগঠিত নিবাসগৃহে উপস্থিত হওয়া যায়। এই গৃহ এক্ষণে বিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার পরেই আকবরের প্রকৃত প্রাসাদাবলী। প্রথমেই অশ্বশালা। এখানে শতাধিক অশ্ব ও বহুসংখ্যক উষ্ট্র রাখিবার বন্দোবস্ত আছে; সাজসরঞ্জাম সকলই প্রস্তরের, তাই এতদিন পরে আজও কিছু নষ্ট হয় নাই!

তৎপরে যোধাবাইয়ের মহল। একটি অত্যুচ্চ কারুকার্য্যবহুল দ্বার অতিক্রম করিয়া এই মহলে প্রবেশ করিতে হয়। উত্তরে দক্ষিণে প্রস্তরের ছাদবিশিষ্ট অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ; এগুলি গাঢ় নীলবর্ণে অতি সুন্দররূপে মিনা করা। প্রাসাদ রক্ত-প্রস্তরে গঠিত; কাজেই এই বর্ণবৈচিত্র্য যে অত্যন্ত নয়নারাম, সে কথা বলা বাহুল্য।

যোধাবাইয়ের প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কতকগুলি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ; সে সকলের মধ্যে মন্ত্রিবর বীরবলের গৃহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহনির্ম্মাণে লৌহ বা কাষ্ঠ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই; কেবল রক্তবর্ণ বালুপ্রস্তরেই সমগ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহের সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত;

—দেখিলে প্রস্তরের গঠন বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় যেন কোন জাপানী শিল্পী হস্তিদন্তের উপর নানা চিত্র খোদিত করিয়াছে। গৃহের উপরিতল কয়টি গম্বুজে শোভিত। এই গৃহ এক্ষণে দর্শকদিগের বিশ্রামাগারে পরিণত হইয়াছে।

প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে আর একটী প্রাসাদ আকবরের খৃষ্টান বেগম মরিয়মের প্রাসাদ বলিয়া লোকে অভিহিত করিয়া থাকে। এই প্রাসাদের দ্বারের উপরিভাগ বাইবেলে বর্ণিত নানা চিত্রে সুশোভিত; কিন্তু আকবরের পরবর্ত্তী গোঁড়া মুসলমানদিগের কৃপায় এখন তাহার অধিকাংশই বিনষ্টপ্রায়, শ্রীহীন। কেহ কেহ আকবরের খৃষ্টান-মহিষীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কিন্তু যখন তাঁহার খৃষ্টান মহিষী থাকা না থাকা উভয় পক্ষেই উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, তখন এমন একটা মধুর জনশ্রুতিতে অবিশ্বাস করিয়া লাভ কি? বীরবলের ও মরিয়ম বেগমের গৃহের মধ্যে উদ্যানে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র মসজিদ অবস্থিত; বোধ হয়, অন্তপুরচারিণীবৃন্দ এখানে উপাসনা করিতেন।

ইহারই নিকটে প্রসিদ্ধ পঞ্চমহল। ইহার প্রথমতলে ছাপান্নটি স্তম্ভ; তন্মধ্যে কোনও দুইটির গঠন একরূপ নহে। দ্বিতলে পঁয়ত্রিশটি, ত্রিতলে পনেরটি ও চতুর্থতলে আটটি স্তম্ভ। সর্ব্বোপরি চারিটি স্তম্ভের উপর একটি গম্বুজ। এই পঞ্চমহলের কোন দুইটি স্তম্ভের মাতলার কারুকার্য্য একরূপ নহে। এই সুবৃহৎ



পঞ্চমহল—ফতেপুর ।

গৃহ শুদ্ধান্তশোভিনীদিগের সমীর-সেবনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহের দুইটি স্তম্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একটি স্তম্ভ দুইটি করিকরে বিজড়িত; অপরটিতে একজন মনুষ্য বৃক্ষ হইতে ফল চয়নে রত। কথিত আছে, শেষোক্তটি কোন বৌদ্ধ-মন্দির হইতে আনীত।

"খাসমহল" একটি প্রস্তরমণ্ডিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণমধ্যে একটি ক্ষুদ্র সরোবর,—পূর্ব্বে ইহাতে কয়েকটি ফোয়ারা ছিল। ইহার দক্ষিণে আকবর শাহের শয়নমন্দির। প্রকোষ্ঠভিত্তি ফার্সী রচনায় শোভিত; বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে অনেকগুলিই বাদশাহের প্রশংসাসূচক।

এই খাসমহলের এক কোণে আকবরের তুর্কিপত্নীই স্তাম্বুলী বেগমের আবাসগৃহ। সমস্ত ফতেপুর সিক্‌রিতে এরূপ সুদৃশ্য প্রাসাদ অল্পই আছে। প্রাসাদাঙ্গে পশুপক্ষী প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃতিক চিত্র খোদিত। একাংশে একটি অতি সুন্দর আরণ্য-দৃশ্য চিত্রিত। স্তম্ভগুলিও নানা প্রকার খোদিত পত্রপুষ্পে শোভিত।

আর একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণপ্রান্তে "দেওয়ান-ই-খাস" অবস্থিত। হর্ম্ম্যতলে দশপঁচিশ খেলার ছক। এই অদ্ভুত অট্টালিকা-নির্ম্মাণের কোনও কারণই দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, ইহা একটি costly architectural freak মাত্র। বহির্দ্দেশ হইতে অট্টালিকাটি দ্বিতল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই সে ভ্রম অপনোদিত হইয়া যায়। হর্ম্ম্যতল হইতে

ছাদ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবধান নাই। গৃহের মধ্যস্থলে একটি সুবিশাল স্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে নানা চিত্র খোদিত। স্তম্ভশির হইতে প্রকোষ্ঠের চারি কোণ পর্য্যন্ত এক-একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতুবৎ পথ; প্রতি পথের শেষ হইতে হর্ম্ম্যতল পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী নামিয়া আসিয়াছে।

ইহার পর স্তম্ভশোভিত প্রাঙ্গণমধ্যে "দেওয়ান-ই-আম।" অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা বন্যপশুর ক্রীড়া-দর্শন ও তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

ফতেপুর সিক্‌রিতে আর একমাত্র উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা "আঁখমিছৌলি।" প্রদর্শকগণ বলেন, এখানে স্বয়ং আকবর শাহ পারিষদবর্গের সহিত "কাণামাছি" খেলা করিতেন। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, উত্তর-কালে সমগ্র ভারতভূমি যাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল, সেই জাহাঙ্গীরের বাল্যক্রীড়ার জন্য এ গৃহ নির্ম্মিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা প্রাসাদের ধনাগার ছিল। দ্বারের গঠন দেখিলে এই শেষোক্ত মতই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। এই অট্টালিকার সম্মুখেই জৈনধরণে নির্ম্মিত সুন্দর ক্ষুদ্র হর্ম্ম্য।

এই প্রাসাদসমূহের বহির্দ্দেশে "হাতিপোল"। দুইটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীর শুণ্ডদ্বয় জড়িত হইয়া এই দ্বার প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার এই নাম। কিন্তু আওরংজীব মুসল-

মানসুলভ প্রতিমাপূজাবিদ্বেষের আতিশয্যে হস্তিদ্বয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। যোধাবাইয়ের মহল হইতে হাতিপোলের উপরিস্থিত গৃহে আসিবার একটী আবৃত পথ আছে।

হাতিপোলের নিকটেই "হীরণ মিণার"। ইহার নিকট দিয়া মৃগাদি তাড়িত হইলে বাদশাহ তাহাদের শিকার করিতেন। ইহা সুরম্য নহে।

ফতেপুর সিকৃরিতে এই সকল অট্টালিকা ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রাণতোষিণী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অট্টালিকা অনেক বর্ত্তমান।

আকবর ফতেপুর সিকৃরিতে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে দুর্গ সম্পূর্ণ না হইবার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হাতিপোলের নিকটেই সেই অসম্পূর্ণ দুর্গের নমুনা—"সাঙ্গিয়া বুরুজ"। এই বুরুজের নিকটেই রাজদরবারে পণ্যবিক্রয়লোলুপ বণিকদিগের জন্য সরাই।

এখন এই সকল প্রাসাদ শ্মশানতুল্য নির্জ্জন। মোগলগৌরবের এই প্রাণহীন অবশেষে আছে কেবল পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি। এখন এই বিজন প্রাসাদে শেখ সেলিম চিস্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত কতকগুলি প্রদর্শক বাস করে।"

ফতেপুর সিকৃরির ইতিহাস বলা হইল; এক্ষণে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলিবার কিছু প্রয়োজন আছে কি? আমার ত মনে হয় না। তবে দুই একটী সামান্য কথা বলা দরকার মনে করিতেছি। প্রথম কথা এই যে, দেওয়ান-ই-খাসে যেখানে বসিয়া বাদশাহ

অমাত্যবর্গ লইয়া মন্ত্রণা করিতেন, আমি পরম উল্লাসে সেই-খানে বসিয়াছিলাম। কিন্তু অমাত্যবর্গ কোথায় পাইব? সেই স্থানে আমার সঙ্গী মহাশয় এবং পথিপ্রদর্শক ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না; সুতরাং দেওয়ান-ই--খাসে সম্রাটের আসনে বসিয়াও বাদশাহগিরী করা আমার অদৃষ্টে হইল না; লাভের মধ্যে এই হইল যে, আমার বহুদিনের সঙ্গী রৌদ্রোত্তাপ-নিবারক চস্‌মাখানি সেইস্থানে ফেলিয়া আসিলাম। বাদসাহের আসনে কি আর চক্ষে ঠুলী দিয়া বসা যায়! তাই আমি আমার চস্‌মাখানি খুলিয়া আসনের পার্শ্বে রাখিয়াছিলাম। তাহার পর সেই নির্জ্জন দেওয়ান-ই-খাসে বাদশাহগিরী করার পর যখন সেই স্থান ত্যাগ করি, তখন স্থানমাহাত্ম্যেই হউক বা আসনের মাহাত্ম্যেই হউক, সামান্য চস্‌মাখানির কথা আর মনে হইল না। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া চস্‌মার কথা যখন মনে হইল, তখন আবার সেই ২২ মাইল যাতায়াত করা অপেক্ষা চস্‌মার মায়া ত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিলাম। পাঁচ মিনিটের জন্য বাদশাহ-গিরী করিতে গিয়া ছয়টাকা মূল্যের চস্‌মাখানি হারাইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিবার পর শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল; কোথায় কি দেখিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটির কথা বলিতে হইয়াছিল; সুধু বলি নাই আমার চস্‌মা হারাইবার গল্পটা,—সেটা তখন গোপন করিয়াছিলাম;

এখন এই 'দশদিনের' কল্যাণে আমার পাঁচ মিনিটের আবু-হোসেনগিরির কথাটা আর গোপন করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না।

সেকেন্দ্রা

সোমবারের প্রাতঃকালটা ত গেল ফতেপুর সিক্‌রিতে; অপরাহ্লকালে গেলাম সেকেন্দ্রায়। ওটি আর এ যাত্রায় বাকী থাকে কেন? পূর্ব্বে যদিও দুই তিনবার সেকেন্দ্রায় গিয়াছিলাম; তবুও আগরায় আসিয়া সেকেন্দ্রায় না যাওয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই মনে হইল।

এবার সঙ্গী হইলেন শ্রীমান ললিতমোহন ও শ্রীমান রামেশ্বর-প্রসাদ। আগরায় আসিয়া প্রায় সকল রকম যানেই চড়া হইয়াছিল; হিসাব করিয়া দেখিলাম গো-যান এবং টমটমই বাকী আছে—এক্কায় চড়িয়াছিলাম। গো যান আরোহণের কোনই সম্ভাবনা দেখিলাম না; কাজেই টমটমকেই এবেলা যানরূপে গ্রহণ করা স্থির করিলাম। আদেশমত একখানি টমটম আসিয়া হাজির হইল। আমরা সেকেন্দ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলাম; আগরার রাজপথের প্রচুর ধূলিরাশি মহানন্দে আমাদিগকে অভিনন্দন করিতে লাগিল।

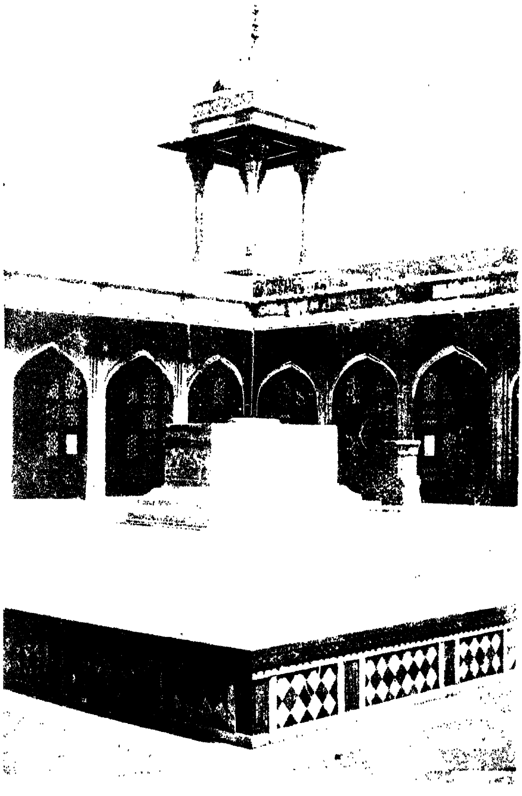
এইবার আবার ইতিহাস বলিতে হইবে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ

স্থানগুলির ঐ একটা মহৎ দোষ; স্থধু এটা দেখিলাম, ওটা দেখিলাম, বাঃ বেশ, ইত্যাদি বলিলে আজকালকার দিনে চলে না;—সে সকল স্থানের কোষ্ঠী-ঠিকুজী দিতে হয়। কাজেই আমাকেও নানা স্থান হইতে ধার করিয়া ইতিহাস বলিতে হইতেছে। কারণ, সেকেন্দ্রার ইতিহাস না বলিলে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামঞ্জুর—এক নাবালক ঐতিহাসিক এই মত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিলেন। দশজনের মন রক্ষা করাই যখন এই বৃদ্ধবয়সে সঙ্কল্প করিয়াছি, সাবালকের কথাই হউক আর নাবালকের কথাই হউক, আমাকে কাজেই সেকেন্দ্রার ইতিহাস একটু বলিতেই হইতেছে। অতএব আপনারা 'যথাযোগ্য অধৈর্য্য সম্বল করিয়া' এই বহুবার-বহুজন-কথিত ইতিহাসের পুনরুক্তি শ্রবণ করুন।

সেকেন্দ্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোগল-সম্রাট্ আকবর চিরনিদ্রায় মগ্ন। এই সমাধিমন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং কোন্ সময়ে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় ও কবে তাহা সমাপ্ত হয়, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। বর্ত্তমানে Ferguson সাহেবের সিদ্ধান্তকেই অনেকে গ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই সমাধিমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আকবর স্বয়ং আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যেই (১৬০৫-১৬১৫ খৃঃ) ইহার প্রবেশদ্বারগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।* Ferguson সাহেবের ন্যায়

---

* Hist. East. and Ind. Arch. (1876), pp. 583; 588, note I.



স্মিথ সাহেব * এবং Grigg সাহেবের গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা ভূমিকা-লেখকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। † ইঁহাদের মতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে এই সমাধি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়; কীন্ সাহেব (১) ও হ্যাভেল সাহেবও (২) এই মত প্রচার করিয়াছেন।

অপরপক্ষে Dr. Fuhrer বলেন, "Ferguson ভ্রমক্রমে এই সমাধিকে আকবরের নির্ম্মিত বলিয়াছেন; জাহাঙ্গীর ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" (৩)

এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ গবেষণা করিতে চাই। পাণ্ডিত্য-প্রকাশের এমন সুযোগ কি ত্যাগ করিতে আছে? আপনারা অবধান করুন। যে সকল মহারথীর নাম করিলাম, তাঁহাদের কাহার কথা সত্য, তাহা এতদিন পরে স্থির করা যায় কি না, তাহার একটু চেষ্টা করিলে কি বিশেষ অপরাধ হইবে?

---

* Colour Decorations in Moghul Arch. E. W. Smith (1901), pp. 2, 20.

† One hundred Photographs and Drawings of Historical Buildings in India (1896) p. 1

(১) Handbook to Agra and its Neighbourhood (1902), p. 73.

(২) Agra and the Taj (1904), pp. 25, 77,

(৩) Ancient Monuments in the N. W. P. Arch. Sur. Ind

যে সমস্ত পর্য্যটক প্রথমে হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উইলিয়ম ফিন্‌চ অন্যতম। ফিন্‌চ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে আকবরের এই সমাধি পরিদর্শন করিয়া ইহার একটি বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন ইহা দেখিয়াছিলেন, তখন ইহার অবস্থা প্রায় বর্ত্তমানের অনুরূপই ছিল; কেবল প্রবেশ-দ্বারগুলির মধ্যে তখন একটি মাত্র নির্ম্মিত হইতেছিল। ফিন্‌চ লিখিয়াছেন "nothing were finished as yet, after *Tenne yeares* work" * (ইংরাজী বানান তাঁহাদেরই, আমার নহে) সেই বর্ষেই কাপ্তেন উইলিয়ম হকিন্স আকবরের সমাধির একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—"It hath beene this *fourteene yeares* a building, and it is thought it will not be finished these seven yeares more, in ending gates and walls, and other needfull things, for the beautifying and setting of it forth." †

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে পিতার সমাধি-মন্দির পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্ম-কাহিনী 'Wakiat-i-Jahangiri'তে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—

"১৭ই মঙ্গলবার (কোন মাসের উল্লেখ নাই) আমি পদব্রজে

* Purchas his Pilgrimes, I. IV. 440 reprint, Vol. IV. 75

† Ibid I II 224 ; reprint 11?. 51

পিতার সমাধি-মন্দির দেখিতে যাই ।……ইহা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার মনোমত বোধ হইল না। আমার ইচ্ছা ছিল,—ইহা এরূপ সুরম্য সৌধ হইবে যে, পর্য্যটকগণ যেন ইহা দেখিয়া না বলিতে পারেন যে, জগতে তাঁহারা এরূপ আর কোন সৌধ কখন দেখিয়াছেন। যখন ইহার নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল, তখন হতভাগ্য খসরুর বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আমি লাহোর গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইতোমধ্যে নির্ম্মাণকারিগণ, যে আদর্শে ইহা নির্ম্মাণ করিবার কথা ছিল, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া তাহাদের নিজ অভিরুচি-অনুযায়ী ইহা নির্ম্মাণ করে। এইরূপে সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, এবং এই নির্ম্মাণকার্য্যে তিন-চারি বৎসরকাল গিয়াছে। যে অংশগুলি আপত্তিজনক বোধ করিয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য সুনিপুণ নির্ম্মাণকারীদের আদেশ করিলাম। এইরূপে অল্পে অল্পে চারিপার্শ্বে সুন্দর উদ্যান-পরিশোভিত এক বিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইল। শ্বেত প্রস্তরের Minaretযুক্ত এক সুবৃহৎ দ্বারও নির্ম্মিত হইল।" *

বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ যে এই সময়ে বাজার-গুজব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ তাহা না হইলে, একই বর্ষে দুইজন পর্য্যটক, সেকান্দ্রার নির্ম্মাণ-

* Elliot Muh. Hist. VI 319-20.

প্রসঙ্গে একজন দশ বৎসর, অপর জন চৌদ্দ বৎসরের উল্লেখ করিতেন না। অপরপক্ষে, যে সমস্ত গ্রন্থ জাহাঙ্গীরের আত্ম-কাহিনী বলিয়া পরিচিত, তন্মধ্যে 'Wakiat-i-Jahangiri'কেই Elliot ও Dowson সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে,—সেকান্দ্রার নির্ম্মাণকার্য্য আকবর আরম্ভ করেন নাই,—জাহাঙ্গীর করিয়াছিলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর ব্যস্ত থাকায় নির্ম্মাণকার্য্যের ভার তিনি নির্ম্মাণকারীদের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন,—এবং রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৬০৯ খৃঃ) তিনি ইহা পরিদর্শন করিবার পর, কয়েকজন সুদক্ষ নির্ম্মাণকারীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই সমাধির অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। ফিন্‌চ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে যখন ইহা দেখেন, তখন ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল এবং একটি প্রবেশদ্বারও নির্ম্মিত হইতেছিল।

প্রধান প্রবেশদ্বারে যে দুইটী খোদিতলিপি আছে, তাহা হইতে এই সমাধি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য কোন্ সময়ে সমাপ্ত হয়, তাহা জানা যায়। উদ্যানপার্শ্বে যে লিপিটী আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীর রাজত্বের ৭ম বর্ষে (নৌরোজ —১৭ই মার্চ্চ ১৬১২) ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করেন। ঐ স্থানে অপর যে লিপিটী আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বর্ষে (নৌরোজ ৮ই মার্চ্চ ১৬১৩) ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। কাজেই ১৬১৩-১৪

খৃষ্টাব্দে বা নির্ম্মাণারম্ভকাল হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে এই সমাধি-মন্দিরের সমস্ত নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল।

ফিন্‌চ ও হকিন্‌স উভয়েই প্রতিদিন তিন হাজার লোককে সেকান্দ্রা-নির্ম্মাণকার্য্যে রত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। যে সমস্ত প্রধান রাজমিস্ত্রী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল Calligraphist আব্‌দুল হক্ সিরাজী ব্যতীত আর কাহারও নাম জানিতে পারা যায় না।

কীন্ লিখিয়াছেন, "এই সৌধ নির্ম্মাণ করিতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।" * কিন্তু তিনি কোথা হইতে এই সংবাদটী পাইলেন, তাহার কোন নজীর উদ্ধৃত করেন নাই।

'ওয়াকিয়তে জাহাঙ্গীরিতে' লিখিত আছে—"এই সুবৃহৎ অট্টালিকার নির্ম্মাণকল্পে ইকাকের ৫০,০০০ তুমান এবং তুরাণের ৪৫ লক্ষ খানি † ব্যয়িত হইয়াছিল। মোগল সম্রাট্‌গণের মুদ্রার মধ্যে 'তুমান' ও 'খানি' আছে বলিয়া মনে হয় না; ইহা হয় ত তুর্ক বা পারস্যরাজগণের মুদ্রা হইবে; কাজেই ইহা কত ভারতীয় মুদ্রার সমতুল্য, তাহা বলিতে পারিলাম না।

কাপ্তেন হকিন্‌স লিখিয়াছেন যে, প্রতি বৎসরই আকবরের মৃত্যুদিনে সেকান্দ্রার সমাধি-মন্দিরে ভোজের আয়োজন হয়। তিনি লিখিয়াছেন—Upon this day there is great store

* Handbook p. 43

† Elliot, V1, 320

of victuals dressed and much money given to the poore.” এই ভ্রমণকারীর মতে জাহাঙ্গীরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি ও তাঁহার সন্তানসন্ততিবর্গ এইস্থানে সমাহিত হইবেন; কিন্তু জাহাঙ্গীর লাহোরে ‘শাহ্‌দারায়’, শাহ্‌জাহান আগরার তাজে এবং আওরংজীব ইলোরা গুহার সন্নিকটে সমাহিত হন! ইহাই সেকেন্দ্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে সেকেন্দ্রার এই সমাধি-ভবন অতি যত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সমাধি-মন্দিরের দ্বারবান আমার সঙ্গী শ্রীমান ললিতের বিশেষ পরিচিত। এই বৃদ্ধ দ্বারবান বহুদিন এই কার্য্য করিতেছে; সে অনেক ইতিহাস বলিতে লাগিল। তাহার ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বা স্বকপোলকল্পিত কিছুই পাইলাম না। সে আমাদিগকে সমস্ত স্থান দেখাইল। অবশ্য তাহার সাহায্য না পাইলেও আমরা সমস্ত স্থানই দেখিতে পারিতাম, কারণ আমি নূতন যাত্রী নহি, আমার সঙ্গীও নূতন নহেন; তবুও এই বৃদ্ধ পথিপ্রদর্শককে ক্ষুণ্ণ করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

বাদশাহের সমাধি একখানি সুন্দর রেশমী আস্তরণে আবৃত রহিয়াছে; আস্তরণখানিতে সাচ্চার কাজ করা আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোগল বাদশাহের সমাধি-আচ্ছাদনের জন্য দুই-খানি আস্তরণ দান করিয়াছেন। আমরা যেখানি দেখিলাম,

সেথানি সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য; বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহারের জন্য যেখানি প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানি বহুমূল্য। আমরা যেদিন গিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর একসঙ্গে সেকেন্দ্রায় গিয়াছিলেন; সেই সময় সেই উৎকৃষ্ট আস্তরণখানির দ্বারা সমাধি আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। আমরা সাধারণ যাত্রী; আমরা আর সে আস্তরণ দেখিতে পাইলাম না। সমাধি-মন্দিরে আলো-প্রদানের জন্যও বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর একটী বহুমূল্য আলোকাধার প্রদান করিয়াছেন। সেটী আমরা দেখিতে পাইলাম।

অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ভ্রমণ করিয়া সম্রাটের সমাধিকে সেলাম করিয়া আমরা সেকেন্দ্রা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং রাত্রিতে অপরাহ্নকালের ভ্রমণ-বিবরণ যথারীতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে জ্ঞাপন করিয়া সে রাত্রির মত বিশ্রাম করিতে গেলাম। সোমবারের কথা শেষ হইল।

কৈলাস

মঙ্গলবার—আজ রাত্রিতে আমরা আগরা ত্যাগ করিব। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজের ব্যবস্থা অনুসারে আজ আমরা সকলে কৈলাসে গমন করিব; মহারাজাধিরাজ বাহাদুরও আমাদের

সঙ্গী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কৈলাস-দর্শনই আমার এবার আগরা-আগমনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য; এই কৈলাস দেখাইবার জন্যই বর্দ্ধমানাধিপতি আমাকে সঙ্গী করিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে —তখন আমি আর এক মানুষ ছিলাম—সেই সময় একবার আমার মাথায় খেয়াল চাপিয়াছিল যে, দেবাদিদেব মহেশ্বরের কৈলাস দর্শন করিতে যাইব। তাই উদ্ভ্রান্তচিত্তে হিমালয়ের মধ্যে কৈলাসের পথ খুঁজিয়াছিলাম। তখন মনে করিয়াছিলাম, শরীরে শক্তি আছে; মৃত্যুর ভয় নাই; সুতরাং 'আমি' চেষ্টা করিয়া কৈলাস-ধামে যাইব;—প্রকাণ্ড একটা 'আমি'র অহঙ্কারে, দর্পে অধীর হইয়া, 'আমি'কে পথিপ্রদর্শক করিয়া কৈলাসে যাইব। হায়, তুচ্ছ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 'আমি'! সেই 'আমিত্বের' দর্প যখন চূর্ণ হইয়া গেল, অভ্রভেদী হিমালয় যখন তুষার-প্রাচীর দ্বারা পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম—পথ মিলিল না। তখন যদি বুঝিতে পারিতাম যে,যে পাথেয় লইয়া আমি কৈলাস-দর্শনে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহা অতি অকিঞ্চিৎ-কর,—তাহা সম্বল করিয়া ও-পথে যাওয়া যায় না,তাহা হইলে হয় ত জীবনের গতি ফিরিয়া যাইত, হয় ত প্রকৃত পাথেয় মিলিত, হয় ত পরে কৈলাস দর্শন হইত! কিন্তু তাহা যে হইবার নয়; তাই একেবারে ফিরিয়া আসিলাম,—একবার কাতরপ্রাণে কৈলাসে-শ্বরকেও ডাকিলাম না।

সে কৈলাস দর্শন হইল না। এ জন্মে হইল না;—কবে হইবে,

কত যুগযুগান্ত, জন্মজন্মান্তর পরে হইবে, কে জানে? সেইজন্যই বহুকালপরে মহারাজাধিরাজ সে দিন যখন কৈলাস দর্শন করাইবার জন্য আমাকে সঙ্গী করিতে চাহিলেন, তখন সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া আমি তাঁহার সঙ্গী হইলাম। আমার যে পাথেয় নাই, তাহা আমিও জানিতাম, তিনিও জানিতেন; কিন্তু আমি এবার পাথেয় সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হই নাই; সে ভার যিনি গ্রহণ করিলেন, তিনি তাঁহার রাজভাণ্ডারের অবস্থা বুঝিয়াই আমার ভার লইয়াছিলেন;—আমি ব্যস্ত হইব কেন?

আমার একটা কথা বড়ই মনে হইয়াছিল; সে কথাটা এখানে বলিয়া রাখি। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আমাকে যখন 'কৈলাস দর্শনে' যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, তখন আমার মনে বড়ই একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। যখন আমি সব ছাড়িয়া, কম্বল-সম্বল করিয়া হিমালয়ে গিয়াছিলাম;—যখন শারীরিক কষ্ট যথেষ্ট উপেক্ষা করিয়াছিলাম;—যখন নিতান্ত দীন-দরিদ্রের বেশে কৈলাস-দর্শনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম; যখন একটী পয়সাও সম্বল ছিল না; তখন আমার অদৃষ্টে কৈলাস-দর্শন হইল না; আর এতকাল পরে, এই ঘোর-বিষয়াসক্ত, এমন স্বার্থপর, এত কলুষকলঙ্কিত আমার অদৃষ্টে কৈলাস-দর্শনের সুযোগ হইতে চলিল কেন? সুধু কি সুযোগ,—একেবারে রাজযোগ! আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, তখন কৈলাস হিমালয়ের অপর-পারে ছিল; তখন কৈলাসের পথরোধ করিয়া নগাধিরাজ হিমালয় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; তখন চিরতুষাররাশি

আমার গমনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল; আর এখন কি না সেই কৈলাস হিমালয় ত্যাগ করিয়া আগরার অদূরে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত মহম্মদ পর্ব্বত-সমীপস্থ না হওয়ায় পর্ব্বতই না কি মহম্মদের সমীপস্থ হইয়াছিলেন! হজরত মহম্মদের নিকট পর্ব্বত আসিতে পারে—মহম্মদ যে মহাপুরুষ! কিন্তু আমি কে? আমি সংসারাসক্ত, নরকের কৃমিকীট, স্বার্থের দাসানুদাস;—আমার জন্য কৈলাস আসিবে কেন? আসিবে কেন, আসিল কেন, তাহা জানি না; কিন্তু আমি কৈলাস-দর্শনের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়াই মহারাজাধিরাজের সঙ্গী হইয়াছিলাম।

আজ মঙ্গলবার সেই কৈলাস-দর্শনে যাইব। পূর্ব্বদিন রাত্রিতেই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছিল। রাত্রিশেষে মহারাজের অনুচরগণ কৈলাসে গমন করিবে; তাহারা সেখানে আমাদের আহারের আয়োজন করিবে। মহারাজ এবং আমরা সকলে কৈলাসে সেদিন চড়ুইভাতি করিব। প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহারাজ এক মোটরে কৈলাসে যাইবেন; আমি এবং আমার সঙ্গী মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতমোহন দাস, মহারাজের চিকিৎসক শ্রীমান নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মহারাজের চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ—এই চারিজন দ্বিতীয় মোটরে যাইব।

কৈলাস দেখিতে যাইব, বহুদিনের আশা-পূর্ণ হইবে, এই সমস্ত কথা ভাবিতে-ভাবিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল। ঐ বুঝি রাত্রি শেষ

হইল, ঐ বুঝি প্রভাতের পাখী ডাকিল, ' ঐ বুঝি আমাদের মোটর আসিল ;—এই রকম উদ্বেগে আমি সারারাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হয়, তাহাই হইল ; ভোরের সময় আমি ঘোর তন্দ্রামগ্ন হইলাম। শ্রীমান ললিত-মোহন ও ডাক্তার নন্দলাল প্রস্তুত হইয়া আমার বাসায় আসিয়া দেখেন, আমি শয্যাত্যাগ করি নাই। ডাক্তার নন্দলাল সুগায়ক ; তিনি তখন আমার নিদ্রাভঙ্গের জন্য গান ধরিলেন—

"হারে রে, রে, রে রে উঠরে কানাই,
বেলা হ'ল চল, চল গোঠে যাই।"

নন্দলালের সেই মধুর গীতধ্বনিতে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল ; চাহিয়া দেখি আমার শয্যাপার্শ্বে নন্দলাল ও ললিতমোহন। ললিতমোহন বলিলেন, "এই বুঝি দাদার ভোরে নিদ্রাভঙ্গ ! উঠুন, উঠুন, মহারাজ প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে চ'লে গেছেন।" আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, "তোমার মহারাজ ত আর রাত্তিরে ঘুমান না ?" ললিত বলিলেন, "তিনি কি তবে সারারাত্রি জেগে থাকেন ?" আমি বলিলাম, "সারারাত্তির জাগে দুই-জন—এক চোর, আর সাধক। মহারাজ তোমাদের একাধারে দুই-ই। আমি সাধক ত নই-ই, তোমার মহারাজের মত চোরও নই।" নন্দলালের গান আট্‌কায় না ; তিনি অমনি গান ধরিলেন—

দশমদিন

"আয় দেখি মন চুরী করি,
ওরে, তোমায় আমায় একত্র রে;
শিবের সর্ব্বস্বধন শ্যামা-চরণ
যদি আন্‌তে পারি হরে'।"

ললিত বলিলেন, "এখন উঠুন, পাকা সাতটী মাইল যেতে হবে!" আমি বলিলাম "প্রাতঃকৃত্য!" উত্তর হইল "প্রাতঃকৃত্য, তৈজসপত্র, খুঙ্গীপুথি, সব সেখানে হবে।" এই বলিয়া ললিতমোহন আল্‌নার উপর হইতে একখানি কাপড় একখানি তোয়ালেতে জড়াইয়া লইলেন; আমি হাতেমুখে একটু জল দিবারও অবকাশ পাইলাম না; একখানি মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। গেটের নিকটেই আমাদের মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা চাপিয়া বসিলাম। মোটর বিকট শব্দ করিয়া কৈলাস-উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

আমরা যে কৈলাস-দর্শনে যাইতেছি, তাহা আগরা হইতে সাত মাইল দূরে যমুনাতীরে অবস্থিত। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' মহামতি সম্রাট্ আকবর শাহের নশ্বরদেহ যেখানে সমাধি-শয্যায় রহিয়াছে, সেই সেকেন্দ্রার সম্মুখ দিয়া যে রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া কিছুদূর গমন করিলেই দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটী প্রশস্ত পথ পাওয়া যায়; সেইটি কৈলাসের পথ। সেই পথে কিছুদূর গেলেই যমুনাতীরে কৈলাসে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই স্থানের নাম কৈলাস কেন হইল, কে এ স্থানে প্রথম আশ্রম

প্রতিষ্ঠা করেন, এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এবং এখানকার জনশূন্য শৈলমালা সাধনার উৎকৃষ্ট স্থান মনে করিয়া কে এখানে সর্ব্বাগ্রে আগমন করিয়াছিলেন, এখানে যমুনাতীরে যে একটী ধরমশালা আছে, তাহাই বা কে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এ সকল তথ্য-সংগ্রহের কোন চেষ্টাই আমি করি নাই, চেষ্টা করিবার কোন প্রয়োজনও অনুভব করি নাই; কারণ আমি ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে বসি নাই; আমি ত পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য সেখানে যাই নাই। আমি দেখিতে গিয়াছিলাম যে, যে স্থানকে কৈলাস নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা আমার কল্পনার কৈলাসের সহিত মিলে কি না? দেবাদিদেব মহেশ্বরের কৈলাসের অনেক বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, অনেক দৃশ্য আবার মনে-মনেও গড়িয়া লইয়াছিলাম; এই কৈলাসে তাহার কিছু আছে কি না, তাহাই দেখিবার ইচ্ছা আমার প্রবল হইয়াছিল। আরও এক কথা। যে আদি কৈলাস আমি দেখিতে যাইতে পারি নাই, এ জীবনে আর পারিব না; সেই কৈলাসের নামগ্রহণ করিয়া যে স্থান আগরার অদূরে অবস্থিত, তাহা দর্শন করিলেও যদি ক্ষণেকের জন্য আমার বাসনা কিঞ্চিৎ চরিতার্থ হয়, তাহা হইলেও আমার যাত্রা বিফল হইবে না!

আমাদের মোটর যখন কৈলাসের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন দেখিতে পাইলাম আমরা লোকালয় হইতে দূরে আসিয়াছি। সম্মুখে কতকগুলি ছোট-ছোট প্রস্তর-মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাইলাম।

এগুলিকে মৃত্তিকাস্তূপ না বলিয়া শৈলমালা বলিলেই ঠিক কথা বলা হয়। দেখিতে-দেখিতে আমাদের মোটর এই শৈলশ্রেণীর নিকটস্থ হইল। সঙ্গীরা বলিলেন, মোটর আর অগ্রসর হইতে পারিবে না; আমাদিগকে এই স্থান হইতে পদব্রজে মহারাজাধিরাজের আশ্রমে উপস্থিত হইতে হইবে। মোটর ত্যাগ করিয়া, তখন আমরা পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া যে অপ্রশস্ত নূতন পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই আঁকাবাঁকা পথে চলিতে লাগিলাম; কিঞ্চিৎ চড়াই উৎরাইও ভাঙ্গিতে হইল। তাহার পরেই দেখিলাম, অদূরে একটী টিলার উপরিভাগে মন্দিরের মত একটা প্রস্তরনির্ম্মিত অতিক্ষুদ্র গোলাকার গৃহ; তাহার ছাদের উপরে চারিপার্শ্বে কয়েকটী ক্ষুদ্র স্তম্ভ; তাহার উপরে একটা প্রস্তরের আচ্ছাদন। সেই আচ্ছাদনের নিম্নে ঠিক ছাদের মধ্যভাগে একখানি প্রস্তরের আসনের উপর গরদের বস্ত্র পরিধান করিয়া মহারাজ বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে একজন গৈরিক-পরিহিত বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপবিষ্ট এবং পার্শ্বে রাখাল দাদা রহিয়াছেন। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-সোপান অতিক্রম করিয়া সেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে মহারাজ আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি উপরে উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বেই বসিলাম। তিনি সন্ন্যাসীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর মহারাজ সন্ন্যাসীর সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন।

আমি আর সেখানে বসিয়া কি করিব? ধর্ম্মালাপ শুনিবার জন্য ত আমি সেখানে যাই নাই। আমাকে সেই স্থানের পবিত্র শান্ত দৃশ্যই অধিক আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কি সুন্দর, কি মনোরম, কি পবিত্র সেই স্থান! সেই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়াই যমুনা প্রবাহিত হইয়াছেন। যমুনার জল ধীরে-ধীরে চলিয়া যাইতেছে; অপরপারে দূরবিস্তৃত বালুকাময় তীরভূমি; তাহার প্রান্তে অরণ্যের শ্যামশোভা। কবি নহি, চিত্রকর নহি, ভাবুকও নহি। হায়! দেখিবার মত চক্ষুও নাই;—কলনাদিনী যমুনার আহ্বানবাণী শুনিবার মত কর্ণও নাই। আমি সে স্থানের কি বর্ণনা দিব?

তবুও দেখিয়াছিলাম—নয়ন-মন এক করিয়া সেই পবিত্র আশ্রমভূমির, সেই দূরবিস্তৃত শৈলমালার, সেই কলনাদিনী যমুনার স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম! যমুনা দর্শন করিয়া সুধুই মনে হইতেছিল—

"যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও যার, বিমল তটে, রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্তমণি।"

এতদিনে বুঝিতে পারিলাম, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ভারতবর্ষে এত স্থান থাকিতে এই আগরা সহরে বাস করিতে এত ভালবাসেন কেন? একটু অবকাশ পাইলেই

দৌড়াইয়া আগরায় আসেন কেন? এখানে, এই কৈলাসে তিনি আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এখানে আসিয়া তিনি নিশ্চয়ই শান্তি পান; তাই কর্ম্মকোলাহল দূরে পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন শৈলশৃঙ্গে ছুটিয়া আসেন।

আমি যখন মহারাজের পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া নীচে নামিলাম, তখন তিনি আমাকে মন্দিরের মধ্যে যাইতে বলিলেন। আমি অতি সঙ্কুচিতভাবে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করি কি না; যে মন্দির নির্ম্মাতার সাধনার স্থান, আমি সেখানে প্রবেশ করিয়া তাহার পবিত্রতা নষ্ট করিব কি না। আমার সেখানে, সে দেব-মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আছে কি? মহারাজ যেন মন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন; কিন্তু মহারাজের যিনি মহারাজ, তিনি যদি আমাকে ফিরাইয়া দেন;—তিনি যদি বলেন "দেবদর্শনের জন্য কি অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছ, দেখাও?" তাহা হইলে আমি কি দেখাইব?

এই মনে করিয়াই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। মহারাজ তখন উপর হইতে বলিলেন, "ভিতরে গিয়ে দেখুন না।" তখন আর তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না; মনে করিলাম রাজরাজেশ্বরের আদেশ না পাইলেও তাঁহার প্রতিনিধির আদেশ ত পাইলাম। তখন মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

মন্দিরমধ্যে কোন দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম না;

পূজারও কোন উপকরণ দেখিলাম না। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য কিছুই নাই; পুষ্পাধারও নাই, সিংহাসনও নাই, পূজামঞ্চও নাই। মন্দিরে দেবতার মৃৎ বা প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি না থাকিবার এক কারণ তখন ভাবিয়া পাইয়াছিলাম, আর এক কারণ এখন পাইয়াছি। তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, পাপমলিন হৃদয়ে তখনও বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম যে, এ নির্জ্জন দেবমন্দিরে কোন মূর্ত্তির প্রয়োজনাভাব। যাঁহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এখানে অমূর্ত্ত অবস্থায় সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন; প্রত্যেক শিলাখণ্ডে সেই অরূপীর নয়ন-মন-বিমোহন রূপ প্রতিফলিত রহিয়াছে। 'প্রতীকের' যে এখানে প্রয়োজনাভাব! এখানে তিনি স্বপ্রকাশ! আমি দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ছিল, তাই সেই দেবাদিদেবের সত্তা অনুভব করিতে পারিলাম। কৈলাস-দর্শনে আসিয়া ইহাই আমার পরম লাভ। যেখানে আসিলে মহারাজাধিরাজের ছত্রদণ্ড ধূলায় লুণ্ঠিত হয়, সেখানে আমাদের শূন্যগর্ভ গর্ব্ব-পরিপূর্ণ মস্তক অবনত হইবে না কেন? তখন বুঝিলাম, কাঙ্গাল হরিনাথ কেন কাঁদিয়াছিলেন—

"যদি ডাকের মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন ক'রে
তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পারতে।"

যিনি ডাকার মত ডাকিতে পারেন, তাঁহার কাছে কি তিনি ধরা না দিয়া পারেন? তাঁহার হৃদয়মন্দিরে সেই চিন্ময় দেবতার প্রকাশ না হইয়া কি পারে? আমি এই কৈলাসে আসিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। সত্যসত্যই কৈলাসের সেই দেবমন্দির অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ; অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা তাহার প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে মিশিয়া রহিয়াছে।

অনুভূতির কথা বলিলাম, এখন যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছি, তাহার কথাও একটু বলি। সেই দেবমন্দির একেবারেই সজ্জিত নহে; বাহ্যিক সজ্জার কোন প্রয়োজন নাই, বুঝিতে পারিয়াই বিজয়ানন্দজি এ মন্দির সুধু আনন্দ দিয়াই ভরিয়া রাখিয়াছেন। সেই আনন্দের হিল্লোলেই এই মন্দির পুলকিত। অনেক দিন পূর্ব্বে এক রাতভিখারীর মুখে একটা গান শুনিয়াছিলাম। সে গানের গোড়াটা মনে নাই, কিন্তু একটা অন্তরা আমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। এই আনন্দনিকেতন, এই বিজয়ানন্দ-নিকেতন, এই বিজয়ানন্দাশ্রম দর্শনে বারবারই সেই গানটা আমার মনে পড়িয়াছিল—

"সেথা আনন্দ-শাখীতে পাখী আনন্দ-সঙ্গীত গায়,
আনন্দময় ফুল ফল তায় বহিছে আনন্দ-বায়;
নিত্যানন্দধাম সে যে, কিছু নাই আনন্দ বই,
পিতা সদানন্দ আমার, মাতা যে আনন্দময়ী;

যদি কারু লাগে ক্ষুধা,
খেতে দেন আনন্দসুধা ;
তাইতে দ্বিজ গোবিন্দের আজ এত আনন্দ মরণে।"

দ্বিজ গোবিন্দ সত্যসত্যই বলিয়াছেন, এমন আনন্দের হাটে মরণে বড়ই আনন্দ! এই আনন্দনিকেতন দর্শনেও আমার সেই কথাই মনে হইয়াছিল; মনে হইয়াছিল, হায় কি পুণ্য করিলে এই বিজয়ানন্দ-আশ্রমে আনন্দ-সঙ্গীত-শুনিতে-শুনিতে, আনন্দময়ের নাম করিতে-করিতে আনন্দধামে চলিয়া যাওয়া যায়। কি পুণ্যে—কি সাধনায়? ও গো বলিয়া দাও, কি মূল্যে এই সাধের মরণ ক্রয় করা যায়? এখানে আসিলে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। বাঁচিয়া থাকিলে যে আমাদের অনেক জ্বালা,—আনন্দ উপভোগের যে অনেক বিঘ্ন। তার চাইতে আনন্দসাগরে ডুবিয়া মরাই প্রার্থনীয়।

থাকুক সে কথা। মন্দিরের কথা বলি। মন্দিরে কোন সাজসজ্জা নাই, কোন দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার এক কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর একটা কারণ পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অল্প কয়েকদিন হইল একখানি ইংরাজী পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার নাম "Meditations।" সেই পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"The scene changes—I am in a Shi-

valaya. Strings of temples of white marble, but not a soul in it ! I shudder. I am lost in reverie. I think, I pray again, and the answer is 'Get ready to have a fight with sorrow and grief—with struggle and strife—these are only foreshadows. Do you not see why I showed you these Temples, but no devotees ? Because, that is how they worship me. They only pray to these symbols, not to me—hence their prayers are soulless, temples lifeless.' I see the sign and bow." মহারাজাধিরাজের এই কথাতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের কথা বুঝিতে পারিয়াছি।

মন্দিরে সাজসজ্জা নাই, দেবমূর্ত্তি নাই। তবে আছে কি ? যাহা আছে, তাহা পূর্ব্বে একটু বলিয়াছি। এখন যাহা চক্ষে দেখিলাম, তাহাই বলি। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখি দুই পার্শ্বে দুইটি দ্বার। সেই দ্বারের সম্মুখেই দুইটা সোপানশ্রেণী ভূগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। সেই সোপানাবলি দিয়া নামিয়া ভূগর্ভে দুইটী গুহা। গুহার মধ্যে কেবল একখানি করিয়া সামান্য আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। আর কিছু নাই—আর কিছু চর্ম্মচক্ষে দেখিবার নাই। আমি আর কিছু দেখিতে পাই নাই। যিনি এই গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি এই গুহায় সময় অতিবাহিত করেন, তিনিই

বলিতে পারেন, এই ভূগর্ভে অন্ধকারময় অপ্রশস্ত গুহায় আর কি আছে? কি আছে, যাহার জন্য ধনজন-ঐশ্বর্য্যবেষ্টিত মহারাজ এই অন্ধকার গহ্বরে দিনাতিপাত করেন।

গুহা দর্শন হইল,—দেবদর্শন হইল না। এমন সময় দ্বারের নিকট হইতে শব্দ আসিল "আসুন"। আমি কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম মহারাজাধিরাজ আহ্বান করিতেছেন;—কিন্তু চাহিয়া দেখিলাম—বিজয়ানন্দ! আমার এই দেবমন্দির এবং এই কৈলাস-দর্শন এই স্থানেই শেষ হইল। যাহা অনীর্ব্বচনীয়, তাহা বলিবার চেষ্টা করিয়া কি করিব?

মন্দির হইতে বাহিরে আসিলাম। তখন সকলে মিলিয়া আর একটি আশ্রম, আর একটি মন্দির দেখিতে গেলাম। মহারাজের এই মন্দির যে শৈলশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, অপর মন্দির বা আশ্রম তাহা হইতে কিছু দূরে আর একটি শৈলশৃঙ্গে নির্ম্মিত হইয়াছে,—মহারাজই নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্যই এই আশ্রমটি নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি এখন এই আশ্রমচ্যুত। পূর্ব্বে যে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছি, এখানে এখন তিনিই সশিষ্য বাস করেন। আমরা খানিকটা পথ ঘুরিয়া এই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কয়েকটা সন্ন্যাসী এই আশ্রমে রহিয়াছেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি একটু পিছনে পড়িয়াছিলাম। আমি যখন সেই আশ্রমদ্বারে

উপস্থিত হইলাম, তখন আমার আর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না। দ্বারের নিকট হইতেই চাহিয়া দেখিলাম, প্রকোষ্ঠের মধ্যে কতকগুলি হাঁড়ি সাজান রহিয়াছে। আরে, হাঁড়ি!—তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর নাই। কৈলাসে আসিলাম—তবু হাঁড়ি সঙ্গেই আসিয়াছে। এই হাঁড়ি যে লোকালয়ে ফেলিয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। হাঁড়ির চিন্তাতেই ত এত-দিন কাটিয়া গিয়াছে। সামান্য এক দণ্ডের জন্য যে হাঁড়ির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেই হাঁড়ি আগের খেয়ায় পার হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে! হায়! হাঁড়ি, তুমি আমার সঙ্গ কি ত্যাগ করিবে না? তাই এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের স্কন্ধে ভর করিয়া তাঁহাদের সাধনাশ্রম দখল করিয়া বসিয়া আছ? বুঝিলাম গৃহী হইলেও হয় না, সন্ন্যাসী হইলেও হয় না;—হাঁড়ি সহজে সঙ্গ ছাড়ে না। তখন কাঙ্গাল হরিনাথের সেই গানটি আমার মনে পড়িল—

বৈরী জটিলা কুটিলা আমার বাসনা।
আমি মনেতে করি, গৃহ সাধন-অরি,
বনে যাব, নাম করিব দিবা-সর্ব্বরী;
কিন্তু, বাসনা থাকিলে মনে বনে গেলেও যন্ত্রণা।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না; বিষণ্ণ মনে সে স্থান ত্যাগ করিলাম; পঙ্কমলিন হৃদয়কে যদি বা একটু

খিতাইয়া লইয়াছিলাম, এই দৃশ্য দেখিয়া আবার তাহা পঙ্কিল হইয়া গেল ; ক্ষুদ্র হৃদয় আবার ক্ষুদ্রতায় পরিপূর্ণ হইল। আমার এই ভাবপরিবর্ত্তন মহারাজের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তিনি আমাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন চুপ করে গেলেন কেন ?" আমি বলিলাম "এ আশ্রমটী আমার ভাল লাগিল না।" তিনি আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন ; তাই বলিলেন, "আমিও তা বুঝতে পেরেছি ; অনেকগুলো নানাভাবের লোক এসে স্থানটাকে গোল করে দিতে বসেছে।"

তাহার পরই মহারাজ স্নান করিতে গেলেন ; আমরাও, যেখানে আমাদের আহারের আয়োজন হইতেছিল, সেইস্থানে গেলাম। মহারাজ পূর্ব্ব রাত্রিতে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কৈলাসে সকলে মিলিয়া চড়ুইভাতি করা হইবে। আমি মনে করিয়াছিলাম, মহারাজ রন্ধন করিবেন, আমরা জল টানিব, কাঠ কুড়াইব, বাঁটনা বাঁটিব, তরকারী কুটিব,—বেশ চড়ুইভাতি হইবে। কিন্তু মহারাজ এ আনন্দ সম্ভোগ করিতে দিলেন না, রাজহস্তের রাঁধা খিচুড়িভোগ পাইবার সৌভাগ্য হইল না। দেখিলাম, একদল ভৃত্য, রাঁধুনী ও কর্ম্মচারী আসিয়া রাজ-ভোগের আয়োজন করিয়া বসিয়াছে। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। আমি গরিব মানুষ, গরিবের মত চড়ুইভাতি হইবে বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু এ চড়ুইভাতির উদ্যোক্তা যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ,—কৈলাসের বিজয়ানন্দ নহেন !

তখন বুঝিলাম, এই যমুনাতীরে মহারাজ আমাদের জন্য রাজোচিত চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমরা তখন সকলে মিলিয়া যমুনায় অবগাহন করিলাম। তাহার পর মহারাজকে লইয়া ভোজন। মহারাজের ব্যবস্থিত চড়ুইভাতির একটা বর্ণনা দিব কি? আমরা ছেলেবেলায় চড়ুইভাতি করিতাম। সে এক ব্যাপার! হৈ হৈ কাণ্ড! সকলের প্রাণান্ত পরিশ্রমে অপরাহ্ণ তৃতীয় প্রহর গতে আমরা চড়ুইভাতির খিচুড়ি আহার করিতাম; হয় ত খিচুড়ির ডাইল গলিয়া একেবারে অস্তিত্বশূন্য হইয়াছে, এদিকে চাউলগুলি মোটেই সিদ্ধ হয় নাই; আলুভাজা হয় ত কাঁচা আছে, বেগুনপোড়া হয় ত দগ্ধ অঙ্গারবর্ণ হইয়াছে; শাকের ঘণ্ট হয় ত লবণে পুড়িয়া গিয়াছে। আর আমরা সেই সকলই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া পরমানন্দে আহার করিয়াছি; একটুও ক্লেশবোধ হয় নাই, অজীর্ণও হয় নাই। আর মহারাজের এই চড়ুইভাতিতে সে সব কিছুই নাই। উৎকৃষ্ট পুরী, নানা-উপাদেয় মস্লা-সমন্বিত পোলাও, বহুবিধ নিরামিষ তরকারী, (আমিষের সম্বন্ধও সে দিন ছিল না) তাহার পর দধি ক্ষীর পায়সান্ন, নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফলমূল। ইহার নাম রাজভোগ—চড়ুইভাতি নহে। সে যাহাই হউক, তাহাতে প্রকৃত ব্যাপারের কিছুই বিঘ্ন হইল না। এই বিপুল আয়োজনের যথারীতি সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা জয়ধ্বনিপূর্ব্বক কৈলাস ত্যাগ করিলাম এবং অপরাহ্ণকালে

বাসায় আসিয়া এই গুরুতম চড়ুইভাতির জের মিটাইতে আমাদের সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন যাত্রার আয়োজন করিতে হইল। রাত্রি দশটার সময় তিন দিনের প্রবাসস্থান আগরা ত্যাগ করিয়া আমরা রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম এবং আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে উঠিয়া শয়নের আয়োজন করিলাম। শুক্রবার কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলাম, মঙ্গলবার আগরা ত্যাগ করিলাম। আমার **দশদিনের** এক অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়া গেল।

কাশীর পথে

ইংরাজী মাসের বুধবার, যখন পড়িল, তখন আমরা তণ্ডুলা ষ্টেশনে। বর্দ্ধমানাধিপতি মহোদয় তাঁহার গাড়ীতে নিদ্রিত, আর আমরা সে রাত্রি নিদ্রা যাইব না বলিয়া একেবারে কৃতসঙ্কল্প! কখন শয়ন করিয়া, কখন বসিয়া, কখন বা ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে পাইচারি করিয়া, এবং কথাটা গোপন করিবারও বিশেষ প্রয়োজন দেখি না, পাঁচ ছয়বার চায়ের শ্রাদ্ধ করিয়া আমরা কয়েকটী জীব রাত্রি-জাগরণ করিলাম।

আমরা যে গাড়ীতে উঠিব, তিনি শেষরাত্রিতে তণ্ডুলা ষ্টেশনে আগমন করেন; কিন্তু রেল কোম্পানী এমনই তৎপর যে, তাঁহারা রাত্রি দশটার পরেই আমাদিগকে সেই গাড়ীতে

তুলিয়া দিবার জন্য আগরা হইতে তণ্ডুলায় আনিয়া বসাইয়া রাখিলেন; ঐ সময়ের পর সারারাত্রির মধ্যে আগরা হইতে আসিবার আর গাড়ী নাই। ব্যবস্থা যে অতি সুন্দর, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুচরবর্গ সর্ব্বদা রেলে বেড়াইয়া একেবারে আটঘাট চিনিয়া লইয়াছেন; কোথায় কি করিতে হইবে, সব তাঁহারা জানেন। ডাক্তার বাবু ও সেক্রেটারী মহাশয় স্বাস্থ্যতত্ত্বের আদেশ সম্পূর্ণ অমান্য করিয়া সেই রাত্রি তিনটার সময় ষ্টেশনের স্নানাগারে প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া লইলেন। চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ হিন্দুস্থানী যুবক; স্নানাহারের অভাব তেমন গ্রাহ্যই করেন না; তিনি মহাজনগণের পন্থা অনুসরণ করিলেন না। আর আমি হিন্দুসন্তান;—কাশী যাইবার পথের মধ্যে রেলের স্নানাগারে স্নান করিয়া কি পরকালের পথরোধ করিব? তবে রাত্রিতে অর্থাৎ রাত্রি বারটার পর যে ক্রমাগত চা পান করিয়াছি, তাহাতে কোন দোষ হয় নাই এবং তাহাতে উপবাসও ভঙ্গ হয় নাই; কারণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ত আমাদের মতে পরদিন হয় না। ইংরাজের সবই তাড়াতাড়ি; তাই তাঁহারা রাত্রি বারটার পরই পরের দিন সুরু করিয়া দেন। আমরা ইংরাজের আইন সব স্থানে মানিয়া চলি; কিন্তু সুনিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া রাত্রি বারটার পর দিন বদলাই না; সুতরাং বুধবারের স্নানটা মঙ্গলবার রাত্রিতে করিয়া রাখা আমার পোষাইল

না। গমনসময়ে আমাদের আর একজন সঙ্গী ছিলেন শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয়। তিনি ফিরিবার সময় আমাদের সঙ্গী হইলেন না; তিনি না কি ধীরেসুস্থে মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তবে দেশে ফিরিবেন।

আমার দশদিনের ছুটী। তাহার পাঁচদিন পথে ও আগরায় কাটিয়া গেল; অবশিষ্ট পাঁচ দিন কাশীতে কাটাইবার ব্যবস্থা ছিল। বর্দ্ধমানের সবজজ্ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু দাদা মহাশয় তখন কাশীতে সপরিবারে পূজার ছুটী কাটাইতেছিলেন। অন্য সময়ে, সেই সেকালে যখন কাশীতে যাইতাম, তখন আশ্রয়-স্থান পূর্ব্বে স্থির করিতাম না; তখন যে আমার পূর্ব্বও ছিল না, পরও ছিল না,—ছিল একমাত্র বর্ত্তমান। তখন আমি কাশীতে পৌঁছিয়া একেবারে কাশীশ্বর দেবাদিদেব বিশ্বনাথের শরণ লইতাম;—তখন বিশ্বনাথের আতিথ্যই গ্রহণ করিতাম; তিনিই আহার দিতেন, আশ্রয় দিতেন,—আমাকে কিছু ভাবিতে হইত না। এখন যতই বেলা পড়িতেছে, ততই 'আমি'টা মাথা তুলিতেছে; এখন বিশ্বনাথের আশ্রয় গ্রহণ করা আর হয় না,—এখন নরনাথ খুঁজি। হায় অধঃপতন!

সে কথা থাকুক। আগরায় পৌঁছিবার পরের দিনই শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আদেশ করিলেন যে, আমি সেইদিনই কাশীতে দেবেন্দ্র দাদাকে যেন সংবাদ পাঠাই যে, আমি বুধবারে কাশীতে যাইব; তিনি যেন আমাকে লইয়া যাইবার জন্য মোগল-

সরাই ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দেন। যাহাতে 'তার'-যোগে তাঁহার উত্তর পাওয়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। যথাসময়ে 'তারে'ই উত্তর আসিল—'হাঁ তাহাই হইবে'। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইলেন না; তিনি বলিলেন "মোগলসরাই ষ্টেশনে যদি লোক না আসে, তাহা হইলে আপনাকে একেলা নামিতে দিব না, আপনাকে কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইবে।" হায় মহারাজ, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন? তখন যে আমার এক বিশ্বনাথ ছাড়া কেহই ছিলেন না; তখন আমার মুখের দিকে চাহিবার লোক ত ছিল না; তখন ত একেলাই কত দেশ-বিদেশ, কত পাহাড়-পর্ব্বত ঘুরিয়াছি। আর এখন বর্দ্ধমানাধিপতি আমাকে একেলা কাশী যাইতেও দিতে চাহেন না। বৃদ্ধ বয়সে আমি নাবালক হইয়া পড়িয়াছি। সে কথাও বলি; এখন ত আর সে নির্ভরের ভাব নাই; এখন যে লোটাকম্বল খসিয়া পড়িয়াছে; এখন যে প্রাতঃকালে উঠিয়া চা-পান করিতে হয়; এখন যে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে আহার না করিলে পেট জ্বলিয়া যায়; এখন যে একটু অনিয়ম হইলে মাথা ধরে, জ্বর হয়; এখন যে গুরুভোজন সয় না। হা অদৃষ্ট, ভিক্ষালব্ধ পাহাড়ী রুটিতে যাহার দিন কাটিয়াছে; আধসের তিনপোয়া মোটা চাউল যে সিদ্ধ না করিয়া চর্ব্বণেই উদরস্থ করিয়া এক গণ্ডুষ জলপান করিয়া মহাতৃপ্তি অনুভব করিয়াছে; দুইতিনদিনের অনাহারে

যাহাকে ক্লান্ত করিতে পারে নাই; দুরারোহ পর্ব্বতের দশ-বারো মাইল চড়াই যে হাসিতে-হাসিতে অতিক্রম করিয়াছে;——সে আর এখন নাই! তাই মহারাজাধিরাজের এত সাবধানতা। সে শক্তি-সামর্থ্য নাই; সে সংযম নাই; সে নির্ভরশীলতা নাই; সে উৎসাহ নাই;—সে সকল কিছুই নাই। তাই মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহার এই সঙ্গীটীর পরিচর্য্যার জন্য একদল ভৃত্য নিযুক্ত করেন; ঘণ্টায় পাঁচবার খোঁজ নেন—আমি কেমন আছি; তাই আজ তিনি এই দুর্ব্বল বৃদ্ধ শিশুটীকে বিনা সঙ্গীতে কাশী যাইতে দিতে চান না। তিনি বুঝিয়াছেন, বৃদ্ধের এখন অবলম্বন-যষ্টি চাই। তাহাই হউক!

অপরাহ্নকালে আমাদের গাড়ী মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিল। মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহে আগরায় আমার লগেজ যথেষ্ট বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল। এত সব লইয়া কাশীগমন হইতে পারে না—পাপের বোঝাই যে প্রকাণ্ড! বন্ধুগণ আমার বোঝা বহিতে স্বীকৃত হইলেন; তাঁহারা আমার লগেজগুলি কলিকাতায় আমার বাসায় পৌঁছাইয়া দিবেন বলিলেন। বিছানা ও ব্যাগটীও তাঁহাদের সঙ্গে দিতে চাহিলাম; কিন্তু তাঁহারা সে দুইটি দ্রব্য লইয়া যাইতে চাহিলেন না; সুতরাং তাহাদেরও কাশীদর্শনই স্থির হইল।

মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে দেখা গেল যে, পূজনীয় দেবেন্দ্র দাদা একটী লোক পাঠান নাই—এক রেজিমেণ্ট পাঠাইয়া-

ছেন। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র আমাকে কাশী লইয়া যাইবার জন্য এত লোক! আমি একেবারে এতটুকু হইয়া গেলাম। দেবেন্দ্র দাদার পাঁচটী পুত্র; সে পাঁচজনই ষ্টেশনে আসিয়াছেন; তাঁহার শিশু পৌত্রটিকে যে ষ্টেশনে পাঠান নাই, ইহাই রক্ষা! তাহার পর ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন বর্দ্ধমানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ নবীন উকীল, আমার পরম স্নেহভাজন মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল। কিন্তু হায়, মন্মথকুমার আর ইহজগতে নাই; কাশীতেই তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ! কাশী হইতে বর্দ্ধমানে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই তিনদিনের জ্বরে নবীন যৌবনে মন্মথকুমার সকল মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা, তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারের কথা মনে হইলে এখনও চক্ষে জল আসে। তাহার পর ষ্টেশনে দেখিলাম আমাদের সেই বর্দ্ধমান-সম্মিলনের স্বেচ্ছা-সেবকগণের অধিনায়ক, বর্দ্ধমান কলেজের অধ্যাপক, আমাদের মন্মথকুমারেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল। এতদ্ব্যতীত আরও সাত-আটটি যুবক আমাকে কাশীতে লইয়া যাইবার জন্য মোগলসরাই ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি ত অবাক্। আমার জন্য এত আগ্রহ কেন? এ যে বিপুল অভ্যর্থনা! আমি ত ইহার যোগ্য নহি। নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া কুণ্ঠিত হইলাম; কিন্তু

দেবেন্দ্র দাদার অপার স্নেহের কথা, তাঁহার পুত্রগণের ও মন্মথ গিরীন্দ্রের শ্রদ্ধার কথা মনে করিয়া হৃদয়ে বল পাইলাম। মনে হইল, আমি এমন কি মানুষ যে, আমার উপর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের স্নেহ-অনুগ্রহ অবিরাম বর্ষিত হইতেছে; দেবেন্দ্র দাদার স্নেহ আমাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য সদা অগ্রসর; আর এই যুবকবৃন্দ আমাকে এই শ্রদ্ধাভক্তি করেন। এত স্নেহ, এত অনুগ্রহ লাভ করিবার উপযুক্ত হওয়া যায় কেমন করিয়া। এই বৃদ্ধ বয়সে এক-একবার মনে হইল, উপযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিলে হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে নববলের সঞ্চার হয়, নিজেকে যোগ্য করিবার বাসনা প্রবল হয়।

সে কথা এখন থাকুক। এই রেজিমেণ্টের কেহ আমার বিছানা অধিকার করিলেন, কেহ ব্যাগটা নামাইয়া লইলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া মহারাজাধিরাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। মহারাজও এই রেজিমেণ্ট দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার পর আমাকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "তোমরা না আসিলে আমি ওঁকে একেলা যাইতে দিতাম না।" আমাকে বলিলেন, দেবেন্দ্র দাদাকে পাইয়া যেন ঘরের কথা ভুলিয়া না যাই। আমি অবনতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। কোথাকার কে আমি! এই নগণ্য ব্যক্তির জন্য মহারাজাধিরাজের হৃদয়ে এত অনুগ্রহ, এত স্নেহ!

দশমদিন

মহারাজাধিরাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি আমার পাঁচদিনের দিনরাতের সঙ্গীদিগের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা সকলেই গাড়ীর সম্মুখে প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া ছিলেন। নন্দলাল, ললিত, রামেশ্বরপ্রসাদের নিকট বিদায়-গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা বড়ই বিমর্ষ; বিদায় যেন তাঁহারা দিতে চান না। কিন্তু তাহা কি এ জগতে হয় ভাই! কে কাহাকে কবে স্নেহের বন্ধনে, বাহুপাশে আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে? যেতে দিতেই হয়! কত স্নেহের ধন, আনন্দদুলালদুলালীকে হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিয়া, হাহাকারে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া চিরদিনের জন্য যাইতে হইয়াছে! এ ত পাঁচদিনের জন্য বিদায়! অত কথা বলিবার তখন সময় ছিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল; বন্ধুগণ গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া মুখ বাড়াইয়া বিদায়-অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। মহারাজাধিরাজের গাড়ী-খানি যখন আমাদের সম্মুখ দিয়া গেল, তখন তিনিও হাত নাড়িয়া আমাদের সম্ভাষণ করিলেন। পঞ্জাবমেল কলিকাতার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। আমরা ষ্টেশনের অপরপার্শ্বে দণ্ডায়-মান কাশী-গমনোন্মুখ গাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। সঙ্গীদিগের হাস্য-তরঙ্গে, আমোদ-আনন্দে গাড়ীখানি মুখর হইয়া উঠিল। একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমরা কাশীযাত্রা করিলাম।

দশদিন

ছুটী

অমর কবি মধুসূদন লিখিয়াছেন—

——"রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

কথাটা আমি বিগত পূজার পর সার্থক করিয়াছি,—দীন আমি "রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দূর তীর্থ দরশনে" গিয়াছিলাম। নানা তীর্থে যাই নাই; দুইটি তীর্থে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দুইটিই ভারতের সর্ব্ব-প্রধান তীর্থস্থান;—এক শ্রীশ্রীকাশীধাম—হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান তীর্থ; আর এক আগরা—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান তীর্থস্থান। একটি ভক্তির তীর্থ, আর একটি প্রেমের তীর্থ; এক তীর্থে ত্রিলোকপাবন, বিঘ্নবিনাশন, ভোলানাথ, বিশ্বনাথ;—আর এক তীর্থে প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী তাজমহল! দুই-ই সমান,—দুই-ই অনন্তের পথ দেখাইয়া দেয়;—দুই-ই পাপতাপক্লিষ্ট, ব্যথিত, অভিশপ্ত হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করে। বারাণসীতে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে দাঁড়াইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া 'বাবা বিশ্বনাথ' বলিয়া ডাকিলে যেমন হৃদয় শীতল হয়,—সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা

মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইয়া যায়,—সব যেন ধুইয়া মুছিয়া যায়; তেমনই আগরা-তলবাহিনী যমুনার তীরে চন্দ্রমাশালিনী যামিনীতে জ্যোৎস্না-স্নাত তাজের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া একবার একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে—একবার সেই প্রেমে গঠিত সৌধের দিকে চাহিলে হৃদয়ের সব মলিনতা কোথায় চলিয়া যায়;—প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়; প্রেমের সেই লোক-মনোহর পার্থিব দেবমূর্ত্তির নিকট মস্তক অবনত হয়;—আর তখন অতি দীন, অতি হীনের অবনত-মস্তকে সেই পরম প্রেমময় দেবতার চরণ-স্পর্শ অনুভূত হয়! ক্ষণেকের জন্য জীবন ধন্য হইয়া যায়;—মনে হয়, কতযুগের কত পুণ্যফলে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি,—কত সুকৃতির ফলে ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি,—কত সাধনার বলে 'আমার বারাণসী' 'আমার বাবা বিশ্বনাথ' 'আমার তাজমহল' বলিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। বল—"আনন্দ হয়!"

আমি দশদিনের জন্য এই দুই আনন্দ-নিকেতন দর্শনের ছুটী পাইয়াছিলাম। এখন আর ছুটী মিলে না—মিলিবার যো নাই। যখন-তখনই ত ছুটী পাইয়া ছুটিতে ইচ্ছা করে—উধাও হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে; ইচ্ছা করে—

"উড়ে যাই বিমানের পথে—
শীতল বাতাস লাগুক গায়।"

কিন্তু তা হয় কৈ! পদদ্বয় লৌহ—কেহ বলিবেন—স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। লৌহ-নির্ম্মিতই হউক, আর স্বর্ণ-নির্ম্মিত, মরকত-

খচিতই হউক—শৃঙ্খল ত!—গতিশক্তি রোধ করে ত! দুই দিনের ছুটী করিতে গেলে চারিদিক হইতে দশ-পনরখানি বাগ্রহস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া কতকগুলি কণ্ঠ একস্বরে চীৎকার করিয়া বলে—"ওগো, কর কি? কোথায় যাও?"

ছুটী পাওয়া বড়ই দুর্ঘট! কতবার ছুটিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে;—জীবনে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে—তবুও ছুটীর সময় হয় নাই;—কবিশ্রেষ্ঠ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের বেদনা-কাতর, অশ্রুপ্লাবিত ভাষায়, হৃদয়ের সকল তন্ত্রী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, করুণকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"এখনও যদি হয় নি সময়,
আর কি সময় হবে—
ঘনায়ে আসিল মৃত্যুলগন
মিলন-লগ্ন কবে?
এত দিবসের এত তপস্যা
ব্যর্থই যদি হয়,
জীবন-শেষের নিমেষেও যদি
নয়নে অশ্রু বয়;
চিরদিবসের দেবতা আমার,
জীবন-বন্ধু মোর—
এমন করিয়া জীবন ভরিয়া
কে চাবে করুণা তোর!"

দশদিন

কতবার চেষ্টা করিয়াও যে ছুটী মিলে নাই, বিগত পূজার পর (১৩২২, ৫ই কার্ত্তিক; ২২এ অক্টোবর ১৯১৫) পূর্ণিমা তিথিতে, কেমন করিয়া সে শুভ-সংযোগ হইল ঠিক বলিতে পারি না। সেই বহুদিনের ঈপ্সিত ছুটী মিলিল—একেবারে **দশদিনের** ছুটী। বল—'**আনন্দ হর!**'

সকলেই প্রতিবৎসর পূজার অবকাশে, আফিসের বন্ধে, নানা-স্থানে যায়। আমার ত পূজাও নাই, অবকাশও নাই, আফিসের বন্ধও নাই। আমার আফিস বার-মাস, তিনশত-পঁয়ষট্টি দিনই খোলা। এক আফিস যদি বা বন্ধ হয়, আর এক আফিসের দ্বার আর বন্ধ হইতে জানে না—বন্ধ হইতে চায় না। সকলে আফিস বন্ধ পাইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে যায়,—'শীতল বাতাস' গায়ে লাগাইতে যায়;—আমি এক আফিসের দ্বার কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করিয়া, আর এক চিরদিনের খোলা-আফিসের চির-মুলতবী কাজের দপ্তর মাথায় বহিয়া, প্রবাস-নগরী ত্যাগ করিয়া, আমার ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, মৃত্যুকাতর, জনবিরল পল্লীভবনে যাই। এমনই করিয়া কত পূজা আসিল, কত পূজা গেল!

এবারও তাহাই স্থির করিয়াছিলাম। পূজার দুই তিন দিন পূর্ব্বে আলিপুরের 'বিজয়-মঞ্জিলে' বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। নানা কথার পর তিনি বলিলেন, 'তা হ'লে বাড়ী যাওয়াই স্থির করলেন।' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞা হাঁ, আমার ত ছুটী নেই।' তিনি বলিলেন 'দশদিনের

ছুটীই হোক না। চলুন, পূর্ণিমার দিন দুইজনে কৈলাসে যাই।'

অন্য সময় হইলে ইতস্ততঃ করিতাম; তখন কি জানি কেন, আর ইতস্ততঃ করিলাম না; অমনি বলিয়া ফেলিলাম, 'বেশ, তাই হবে—আমার দশদিনের ছুটী।' বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আদেশ করিলেন, সুতরাং তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে—তাহা নহে; মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনেক আদেশ প্রতিপালন না করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছি। সে ভয় তাঁহার নিকট আমার ছিল না—এখনও নাই। মহারাজের আদেশ নহে—বন্ধুর অনুরোধও নহে—আত্মীয়ের আগ্রহও নহে,—অথচ এই সবই; এবং আরও কিছু। এক-পথের যাত্রীর নিমন্ত্রণ—আহ্বান! ইহারই জন্য দশদিনের ছুটী মিলিল। কে মিলাইল জানি না, কিন্তু মিলিল। 'ভারতবর্ষের' স্বত্বাধিকারী শ্রীমান হরিদাস ও শ্রীমান সুধা ভায়াদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর গ্রহণ করিলাম না;—কাজকর্ম্মের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিবারও প্রয়োজন মনে করিলাম না;—কোন দ্বিধাই করিলাম না। শ্রীমান হরিদাস ও সুধা ভায়াদ্বয় নিশ্চয়ই অমত করিবেন না; স্নেহের জোরেই ছুটী মিলিবে। তাহাই হইল; শ্রীমানদ্বয় সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন; 'ভারতবর্ষের' গুরুভার **দশদিনের** জন্য আমার স্কন্ধ হইতে নামিয়া আমার সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবার ব্যবস্থা হইল। উপেন্দ্র দাদাও সানন্দে স্বীকৃত হইলেন।

বর্দ্ধমানে

ছুটী যখন স্থির হইয়া গেল, তখন স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে দেশে পাঠাইয়া আমি একাকী পূজার কয়দিন কলিকাতায় কাটাইলাম; কাজকর্ম্মের একটা ব্যবস্থা ত করিয়া যাইতে হইবে—**দশ দিনের** জন্য ত নিশ্চিন্ত হইতে হইবে।

দেখিতে দেখিতে যাত্রার পূর্ব্বদিন আসিয়া পড়িল। আমি আলিপুরে যাইয়া শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটু নূতন রকম ব্যবস্থা করিলাম। স্থির হইল যে, আমি পরদিন অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালের গাড়ীতে বর্দ্ধমানে যাইব। সেখানে সমস্ত দিন থাকিয়া রাত্রি এগারটার সময় ষ্টেশনে মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সহিত মিলিত হইব। আমার এ ব্যবস্থা করিবার একটি বিশেষ কারণ ছিল; তাহা এইস্থানে বলিতেছি।

বর্দ্ধমান-গমনের আমার প্রধান আকর্ষণ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর; কিন্তু তিনি যখন বর্দ্ধমানে অনুপস্থিত, তখন আমি সেখানে যাই কেন? বর্দ্ধমানে আমার আরও একটি আকর্ষণ আছে; তাহা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নবপ্রতিষ্ঠিত দেবস্থান—‘**বিজয়ানন্দ-বিহার**।’

এই বিহার যে কি সুন্দর, কি পবিত্র স্থান, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। সে দেবস্থানের, সে 'বিজয়ানন্দ-বিহারের' বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত; আর সাধ্যায়ত্ত হইলেও আমি সে কার্য্যে অগ্রসর হইতাম না। যাহা কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়; যাহার প্রত্যেক মন্দির, প্রত্যেক স্থান নির্ম্মাতার ধ্যানলব্ধ, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে তেমনই ধ্যান-পরায়ণ হইতে হয়, তদ্‌ভাবের ভাবুক হইতে হয়। আমাতে সে ভাবের কণামাত্রও নাই। আমি কেন বৃথা শব্দাড়ম্বর করিয়া সে স্থানের, সেই অতুলনীয় দেবভবনের অবমাননা করিব? বিশেষতঃ, আমি 'বিজয়ানন্দ-বিহারের' সবটা একসঙ্গে দেখিয়া উঠিতে পারি নাই। যখনই বর্দ্ধমানে গিয়াছি, তখনই প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, সহস্রকার্য্য ত্যাগ করিয়া, ঝড়বৃষ্টি মেঘগর্জ্জন উপেক্ষা করিয়া, 'রমণার' শালবন অতিক্রম করিয়া 'বিজয়ানন্দ-বিহারে' উপস্থিত হইয়াছি; এবং যেখানে হয় একস্থানে বসিয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া মন্দিরাধিষ্ঠিত দেবাদিদেবের আরতি দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। সুতরাং 'বিজয়ানন্দ-বিহার' তেমন করিয়া দর্শন কোন দিন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই,—এ জীবনে ঘটিবে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। এ অবস্থায় আমি সে দেব-নিকেতনের বর্ণনা কেমন করিয়া করিব?

এই 'বিজয়ানন্দ-বিহারে' লক্ষ্মী-পূর্ণিমার সন্ধ্যা অতিবাহিত

করিবার জন্যই আমি বৰ্দ্ধমানে যাওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলাম; মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ইহাতে আপত্তি করিলেন না।

শুক্রবার দশটার গাড়ীতে আমি বৰ্দ্ধমানে গমন করিয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম; রাজা অনুপস্থিত, তাই রাজভবনে গেলাম না। তাহার পর অপরাহ্ণকালে 'বিজয়ানন্দ-বিহারে' গমন করিলাম। সেখানে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়া, দেবাদিদেবের আরতি অনেকদিন পরে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং রাত্রি দশটার সময় প্রস্তুত হইয়া বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

যথাসময়ে পঞ্জাব মেল-গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের 'সেলুন' গাড়ী ট্রেণের পশ্চাদ্‌ভাগে সংলগ্ন ছিল। গাড়ী ষ্টেশনে আসিবামাত্র তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ষ্টেশনে উপস্থিত কর্ম্মচারীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীর দিকে গমন করিলাম। আমাদের জন্য একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল। আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলাম। মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতমোহন দাস, প্রধান চিকিৎসক শ্রীমান নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এবং চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ সেই কক্ষে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা আনন্দভরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পরই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

তীর্থপথে

কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, আমি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। সে অপকর্ম্ম আমি আর করিতে সম্মত নহি; এবং তাহার জন্য নিজের অক্ষমতার কথা যথাযোগ্য বিনয়সহকারে নিবেদন করিবারও কোন প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। এই মাত্র বলিয়া রাখিতেছি, আমার এ 'দশদিন' ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে। তবে ইহা কি? তাহাও আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। লেখনী-কণ্ডুতি? হয় ত বা তাহাই! অথবা বৃদ্ধের প্রলাপ? হইতে পারে। যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন, আমি কিছুই বলিতে পারিব না।

একে মেল ট্রেণ—এক এক রাজ্য অতিক্রম করিয়া তবে দম ফিরায়; তাহার পর রিজার্ভ-টিকিটমারা ইলেকট্রিক-আলোকিত, ইলেকট্রিক-পাখাসংযুক্ত দ্বিতীয়শ্রেণীর গাড়ী; তাহার পর বেঞ্চজোড়া সুবিস্তৃত সুকোমল শয্যা; তাহার পর শ্রীমান নন্দলাল-ললিতের আনন্দোচ্ছ্বাস। আরে রাম! ইহার নাম কি ভ্রমণ বলে? ভ্রমণ করিব—তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে;—বসিব এক বেঞ্চে পাঁচ জনের স্থানে এগারজন;—প্রত্যেক ষ্টেশনে আরোহণেচ্ছু যাত্রীর সহিত রীতিমত বচসা করিব; গাড়ীর দ্বারের হাতল টানিয়া ধরিয়া যাত্রীর বল পরীক্ষা করিব; 'এ গাড়ীমে যায়গা নেহি, দুসরা গাড়ীমে যাও' বলিয়া-বলিয়া গলা শুকাইয়া ফেলিব; আরোহণে

অকৃতকার্য্য, প্ল্যাটফরমস্থিত যাত্রীর সুমধুর বাক্যবর্ষণে এবং নূতন-নূতন সম্বন্ধ স্থাপনে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিব; পাটের কলে পিষ্ট পাটের বাণ্ডিলের মত চাপা পড়িয়া বসিব,—আর ও কত কি করিব। তাহারই নাম ভ্রমণ! আর এ কি না, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, ইলেক্‌ট্রিক পাখার হাওয়া খাইতে-খাইতে নিদ্রার কোলে নিশ্চিন্তভাবে আত্ম-সমর্পণ! আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ইহার নাম ভ্রমণ বলে না;—ইহাকে গমন বল, অভিযান বল, আর যাহা খুসী তাহাই বল,—ভ্রমণ বলিও না। অতএব ইহা আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে—নহে—নহে। প্রমাণ—আমরা পরদিন সন্ধ্যার পর তণ্ডুলা ষ্টেশনে নামিয়া গাড়ী-বদল করিয়া আগরার গাড়ীতে উঠিলাম এবং রাত্রি নয়টার সময় আগরায় পৌঁছিয়া মহারাজার প্রাসাদে অৰ্দ্ধ-অতিথি হইলাম। 'অৰ্দ্ধ' কথাটার টীকা করিতে হইতেছে। আমি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের পূরা অতিথি; কিন্তু রাজ-প্রাসাদের অৰ্দ্ধ-অতিথি; কারণ আমার ভোজন রাজপ্রাসাদে হইত, কিন্তু আমার শয়নের জন্য রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে মহারাজা-ধিরাজ বাহাদুর একটি সাহেবের উদ্যানবাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন।

এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমার এ **দশদিন** ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে। আমার সোদরাধিক স্নেহভাজন, 'সাহিত্য'-সম্পাদক শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যখন-তখনই বলেন "দাদাকে একবার কোন্নগর ঘুরাইয়া আনিতে পারিলেই একখানি মাসিক-পত্রের ছয়মাসের খোরাক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।" সেই আমি

কোন্নগর নয়, বর্দ্ধমান নয়, দেওঘর-মধুপুর নয়,—একেবারে সেই অনেক দূর—সেই এক রাজার রাজ্য পার হইয়া, আর এক রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া আগরায় গমন করিলাম ; আর এই সুদীর্ঘ পথের কথা তিন চারি লাইনেই শেষ করিলাম। আমি যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেছি না, তাহার প্রমাণ ইহার অপেক্ষা আর অধিক সন্তোষজনক কি হইতে পারে ?

তবুও '**দশদিন**' লিখিব ; দশ কথাতেই লিখি, আর দশ-দশে একশত পাতেই লিখি,—আমাকে লিখিতেই হইতেছে। কেন ? কৈফিয়ৎ আপাততঃ মুলতবী থাকুক।

এখন কি লিখি ? ভাবিয়া দেখিলাম, আগরা এবং কাশীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় সে সম্বন্ধে আরও-না-হয়-ত শতাধিক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার যে কোন একখানি পড়িলেই সমস্ত বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়। তাহার জন্য আর আয়াস-স্বীকারের কোন প্রয়োজনই নাই। আমিও আগরা বা কাশীধামে তেমন করিয়া বেড়াই নাই, ঘুরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছাও হয় নাই।

এখন হয় ত কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন—'তবে এতদূর গিয়াছিলে কেন ?' আমি আগরায় গিয়াছিলাম তিনটি দৃশ্যের আকর্ষণে। তাহার মধ্যে প্রথম কৈলাস, দ্বিতীয় ফতেপুর সিক্রি এবং তৃতীয় তাজমহল। আমার এই পর্য্যায় দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি

তাজমহলকে সর্ব্বনিম্ন আসন প্রদান করিতেছি। আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি যে, এই তিনটির কেহই কাহারও অপেক্ষা কম নহে—সকলেই প্রথম—সকলেই শ্রেষ্ঠ!

তাজমহল

আগরার কথা যিনিই বলিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাগ্রে তাজমহলের কথাই বলিয়াছেন। মহাজনগণের প্রদর্শিত এ পন্থা আমিই ব অনুসরণ করিব না কেন? কিন্তু এই স্থানেই আমার বিপদ তাজমহলের বর্ণনা—সে ত আমার মত গন্ড-মানুষের কর্ম্ম নহে আমি যাহাতে প্রতিদিন প্রতিরাত্রিতে তাজমহল দেখিতে পারি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন তিনি হয় ত মনে করিয়াছিলেন, আমি একেবারে তাজমহলের সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইব—আত্মহারা হইয়া যাইব; কি আমি যে সে উপাদানে নির্ম্মিত নহি। তাজমহল দেখিতে হইবে যে চক্ষু, যে হৃদয় লইয়া ঐ পবিত্র দেবমন্দিরের সম্মুখীন হইতে হয়, সে চক্ষু, সে হৃদয় আমার নাই। সুতরাং আমি সু দিবাভাগে হা করিয়া তাজের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াছি আর চন্দ্রমাশালিনী যামিনীতে সেই জ্যোৎস্নাস্নাত তাজমহলের পার্শ্বে বসিয়া ভাবিয়াছি,—এ কি একটা সৌধ, না আমার সম্মুখে একটা মহতী কল্পনার ছায়াবাজি। এ কি সত্যসত্যই একট

জড় কিছু, না আমার দৃষ্টিবিভ্রম! আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। রবিবার রাত্রিতে শ্রীমান ললিতমোহন আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ তাজের পার্শ্বে শয়ন করিয়া ছিলাম। রাত্রি অধিক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শ্রীমান আমাকে বলিলেন, "চলুন, যাওয়া যাক্।" আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "চল যাই।" তিনি বলিলেন, "এতক্ষণ কি দেখিলেন?" আমি বলিলাম "কিছুই না।" শ্রীমান ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি জেরা করিতে লাগিলেন। আমি অবশেষে হতাশ হইয়া বলিলাম "কি দেখিলাম, ঠিক বলিতে পারিতেছি না! আমার সুধু মনে হইতেছে, যাহা দেখিলাম তাহা—

"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।"

শ্রীমান্ আর কোন কথা বলিলেন না। আমরা নীরবে তাজমহল ত্যাগ করিয়া আসিলাম।

আমার মনে হয়, বাঁশীর স্বরলহরোত্থিত অমূর্ত্ত রাগিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া—মর্ম্মরের রূপ ধরিয়া এখানে মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। তন্দ্রালস রাগিণীর মূর্ত্ত চিত্র যদি দেখিতে চাও;— যদি দাম্পত্য-প্রেমের অবিনশ্বর কীর্ত্তি দেখিতে চাও—যদি দেখিতে চাও মোগলসম্রাট্ শাহ্‌জহানের জীবনের সুখ-স্মৃতি—যদি দেখিতে চাও প্রেমের কমনীয় মূর্ত্তি, তবে মোগলসম্রাট্‌দিগের লীলাস্থল আগরা নগরীর পাদদেশচুম্বী নীলসলিলা যমুনার তটে আসিয়া ভুবনবিশ্রুত সৌন্দর্য্যাধার এই তাজ একবার নয়ন ভরিয়া

চাহিয়া দেখ ;—চাহিয়া দেখ, সম্রাট্ শাহ্‌জহানের বড় সোহাগের, বড় সাধের স্মৃতির প্রতি। অদৃষ্টের পরিহাসে স্থবির সম্রাট্ যখন আপনার দুর্গমধ্যে আপনি বন্দী—পুত্রের অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবহারে যখন তিনি বেদনাহত, তখন তাঁহার শোকের একমাত্র শান্তিস্থল—তাঁহার সাধের স্বপন—ঐ সৌধ। বন্দী অবস্থায় দুর্গ হইতে ঐ সৌধের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি হৃদয়ে বল পাইতেন। মুমূর্ষু অবস্থায় কোন্ অজ্ঞাত, অজানা দেশে যাইবার পূর্ব্বে কবির ন্যায়, প্রেমিকের ন্যায়, সাধকের ন্যায় আপনার চিরবাঞ্ছিত—চিরসুন্দরের উদ্দেশ্যে দুই বিন্দু অশ্রু ফেলিয়া, এই সৌধের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভারত-সম্রাট্ জন্মের মত ধরাধাম হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। আর এই স্থানেই দয়িতার পার্শ্বে সম্রাট্‌কবি, প্রেমিকবর, প্রেমমন্ত্রসাধক, —সংসারের দুঃখতাপ ভুলিয়া, শান্তিতে শয়ান আছেন।—আর এইখানেই—

"বঁধুর পরশে, ঘুমায় হরষে
মমতাজ সুন্দরী।"

যে লাবণ্যময়ী ললনার স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই প্রেমের মহাতীর্থে সৌন্দর্য্যের স্বপ্নস্বরূপ শ্বেতমর্ম্মরময় তাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহার জীবনকাহিনীর দুই একটি ঘটনা নীরস ইতিহাস হইলেও, আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। অর্জ্জুমন্দ বাণু বেগম ভারত-সম্রাজ্ঞী নূরজহানের ভ্রাতা আসফ্ খাঁর কন্যা। ১৬০৭

খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষ বয়স্ক খুর্‌রমের (পরে শাহ্‌জহান) সহিত জাহাঙ্গীর অর্জ্জুমন্দ বাণুর বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করেন। পাঁচবৎসর পরে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে এই বিবাহ সংঘটিত হয়। তখন খুর্‌রমের বয়ঃক্রম ২০ বৎসর তিন মাস—অর্জ্জুমন্দ তাঁহার অপেক্ষা একবৎসর দুই মাসের ছোট ছিলেন।

পিতা জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্‌জহান সিংহাসন লাভ করেন। এই সময় হইতেই তিনি অর্জ্জুমন্দকে "মমতাজ মহল" নামে আখ্যাত করেন।

সত্য বটে, শাহ্‌জহান মমতাজের সহিত বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে এবং পাঁচ বৎসর পরে যথাক্রমে মুজাফর হুসেন মির্জ্জা ও শাহ নওয়াজ খাঁর কন্যার সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন; তথাপি এই দুইটি বিবাহের মূলে ভালবাসার নাম গন্ধ ছিল না—ইহা 'বা ইকৃতিজা-এ-মস্‌লিহেট' অর্থাৎ রাজনীতিক বিবাহ। শাহ্‌জহান মমতাজকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন—তাঁহার রূপ-গুণের তিনি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। মমতাজ তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। শাহ্‌জহান কি সুখে, কি দুঃখে, যখন যে অবস্থায় যেখানে গমন করিয়াছেন—মমতাজের সঙ্গ তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই।

নূরজহানের মোহিনী শক্তিতে চালিত হইয়া জাহাঙ্গীর যখন পুত্রকে একে একে তাঁহার সমস্ত জাগীর হইতে বঞ্চিত করেন, তখন শাহ্‌জহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'ন ও পরে আত্মরক্ষার্থ

এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হ'ন,—তখনও মমতাজ ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী।

ঊনবিংশ বৎসর বিবাহিত জীবনের ফলে, শাহ্‌জহানের ঔরসে মমতাজের গর্ভে ১৪টি পুত্রকন্যার জন্ম হয়; তন্মধ্যে চারিপুত্র, দারা (১৬১৫ খৃঃ), সুজা (১৬১৬ খৃঃ), আওরংজীব (১৬১৮ খৃঃ), মুরাদ (১৬২১ খৃঃ) এবং তিন কন্যা,—জঁহানারা বা বেগম-সাহেব (১৬১৪ খৃঃ), রোশনারা (১৬১৭ খৃঃ) এবং গহরারা (১৬৩১ খৃঃ) ব্যতীত অবশিষ্ট সন্তানগুলির অতি শৈশবেই মৃত্যু হয়।

ব্লকম্যান সাহেব 'আইন-ই-আকবরীতে' লিখিয়াছেন, মমতাজ সম্রাটের নিকট হইতে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন।

মমতাজের অদৃষ্টে সংসারের সুখভোগ বিধাতৃবিধানে অধিক-দিন স্থায়ী হয় নাই। শাহ্‌জহান যখন খাঁ জহান লোদীর বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন, সেই সময় বুরহানপুরে রাজ্ঞী মমতাজের এক কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যা-প্রসবের কিয়ৎক্ষণ পরেই চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (৭ই জুন, ১৬৩১ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

কাসিম আলি আফ্রিদির "আত্মকাহিনী"তে লিখিত আছে :—"কনিষ্ঠা কন্যা দহর আরার (গহর আরা) জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে মমতাজ, গর্ভস্থিত সন্তানের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জীবনের আশা ত্যাগ করেন এবং অবিলম্বে সম্রাট্‌কে ডাকাইলেন। তিনি কাতরস্বরে

তাঁহাকে জানাইলেন,—'ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, সন্তান গর্ভাবস্থায় ক্রন্দন করিলে মাতা কখনও প্রসবের পর বাঁচে না। হে সম্রাট্! জীবনে যাহা কিছু অন্যায় বা দোষ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন— আমি এখন মরণপথের যাত্রী। অন্তিমকালে আপনার নিকট আমার দুইটি অনুরোধ আছে—প্রতিজ্ঞা করুন তাহা পালন করিবেন।' শাহ্‌জহান প্রতিশ্রুত হইলেন। মমতাজ বলিলেন, 'মঙ্গলময় খোদা আমার গর্ভে আপনার চারি পুত্র ও তিন কন্যা দিয়াছেন; ইহাদের দ্বারাই মোগলগৌরব ও বংশরক্ষা হইতে পারিবে। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা—আপনি আমার সমাধির উপর এমন একটি অবিনশ্বর কীর্ত্তিচিহ্ন সংস্থাপন করিবেন, যাহা জগতে অদ্বিতীয় হইবে।' মৃত্যুশয্যাশায়িনী পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া শাহ্‌জহান বাষ্পজড়িত কণ্ঠে উত্তরে বলিয়াছিলেন "রাজ্ঞী! তোমার অনুরোধ দুইটিই আমি রক্ষা করিব এবং তোমার এরূপ একটি সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিব, যাহা জগতে চিরদিন অতুলনীয় হইয়া থাকিবে।—আর সেই কীর্ত্তিচিহ্ন এরূপ স্থানে সংস্থাপিত করিব যে, প্রাসাদের সকল স্থান হইতে সকল সময়ে তোমাকে দেখিতে পাই।"

উপরিউক্ত ঘটনাবলীর কথা আগরায় এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক 'পাদিশানামা'-গ্রন্থকার আব্‌দুল হামিদ লাহোরী বেগমের মৃত্যুর কথা এইরূপ লিখিয়াছেন:— "যখন মমতাজ নিজের মৃত্যুসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হ'ন, তখন

তিনি কালবিলম্ব না করিয়া কন্যা জঁহানারা দ্বারা সম্রাট্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শাহ্‌জহান অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন। মমতাজ—মাতা ও পুত্রকন্যাদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন।"

মমতাজের মৃত্যুতে সম্রাট্‌ এক সপ্তাহকাল কোন রাজকার্য্যে যোগদান করেন নাই। তিনি বলিতেন,—"রাজ্য-শাসনকে যদি আমি পবিত্র কর্ত্তব্যকার্য্যরূপে মনে না করিতাম, ইচ্ছামত যদি ইহা পরিত্যাগ করা যাইত, তাহা হইলে আমি ফকিরী লইতাম।"

রঙ্গীন পোষাক পরিধান, বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার—এমন কি বার্ষিক অভিষেক-উৎসব ও জন্মদিন-উৎসবে নৃত্যগীতও তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যখনই তিনি প্রিয়মহিষীর সমাধিস্থল দেখিতে গিয়াছেন, তখনই তাঁহার নয়ন বহিয়া অশ্রুনদী প্রবাহিত হইয়াছে।

বুরহানপুরের অপর পারে, তাপ্তিনদীতীরস্থ জৈনাবাদের উদ্যান-বাটিকায় প্রথমে মমতাজের মৃতদেহ রক্ষিত হয় (৭ই জুলাই, ১৬৩১ খৃঃ); পরে ডিসেম্বর মাসে তাহা শুজার তত্ত্বাবধানে আগরায় আনীত হয়।

মানসিংহের পৌত্র রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে আগরার এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড মমতাজের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ক্রয় করা হয়। নানা দেশের শিল্প-বিশারদগণের নিকট হইতে

সম্রাট্ তাজের নক্‌সা গ্রহণ করেন। পরে যে নক্‌সাটি মনোনীত হয়, তাহার একটি আদর্শ প্রথমে কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করা হয়।

মুকারম্মৎ খাঁ ও মীর আব্‌দুল করীমের তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্ম্মিত হয়। 'দেওয়ান-ই-আফ্রিদিতে' উক্ত আছে, এই তাজের নির্ম্মাণকল্পে নয় কোটী সতরলক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। সিংহল, কন্দাহার, যোধপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে আনীত কুড়ি রকমের বিভিন্ন মূল্যবান্ প্রস্তর তাজমহল-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাজের নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হয় এবং ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শেষ হয়। অতঃপর নূতন সমাধি-মন্দির তাজমহলে মমতাজকে সমাহিত করা হয়।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী, মমতাজের দ্বাদশ-স্মৃতি-উৎসবে, শাহ্‌জহান যখন পত্নীর সমাধিমন্দিরে গমন করেন, সেই সময়ে তিনি একলক্ষ টাকার আয়যুক্ত আগরা ও নগরচিন পরগণার ত্রিশখানি গ্রাম তাজমহলের ব্যয়ভার বহনের জন্য উৎসর্গ করেন। অধিকন্তু, সমাধির নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত সরাই ও দোকানপসার ছিল, তাহা হইতেও যে একলক্ষ টাকা আয় হইত, তাহাও তাজমহলের জন্য ও সমাধিমন্দিরস্থ সাধুফকীরগণের ভরণপোষণে ব্যয়িত হইত।

শ্লিমান সাহেব যখন সস্ত্রীক তাজমহল পরিদর্শন করেন, সেই সময়ে তিনি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেন—"তাজমহল দেখিয়া

তোমার কিরূপ মনে হয়?" উত্তরে শ্লিমান-পত্নী বলিয়াছিলেন —"তাজ দেখিয়া কি মনে হয় তাহা বলিতে পারি না; তবে আমার মনে ইহাই উদয় হয় যে, আমার কবরের উপর যদি এইরূপ সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়, তবে আমি কালই মরিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি, আমি কেন, তাজ দেখিয়া অধিকাংশ রমণীর মনেই এই বাসনার উদয় হয়।"

শাহ্‌জহান মুমূর্ষু পত্নীর অন্তিম অনুরোধ উপেক্ষা করেন নাই। তিনি পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, জগতের সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম তাজ নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় তাঁহার প্রণয়িনীর দেহ সমাহিত করিয়া, স্বীয় প্রেম-প্রতিশ্রুতির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

বাহ্যসৌন্দর্য্যে তাজমহল অনবদ্য হইলেও, পবিত্র দাম্পত্য-অনুরাগের নিদর্শন বলিয়া, ইহার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে;—প্রেমের পবিত্রতীর্থ বলিয়া ভারতবাসীর ইহা বড় আদরের—বড় গর্ব্বের সামগ্রী।

তাজ দর্শন করিয়া কত জন কত কথা বলিয়াছেন; তাহার দুই চারিটি এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

An extract from Bayard Taylor's Introductory Remarks:—"* * * If there was nothing else in India, this would alone repay the journey.

The distant view of this matchless edifice satisfied me that its fame is well-deserved. So pure, so glorious did it appear, that I almost feared to approach it lest the charm should be broken. * * *"

আর আমাদের কবিসম্রাট্ সার রবীন্দ্রনাথ তাজমহল দর্শন করিয়া তাঁহার অমর লেখনীমুখে যে অমৃতধারা বর্ষিত করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কবিসম্রাট্ লিখিয়াছেন :—

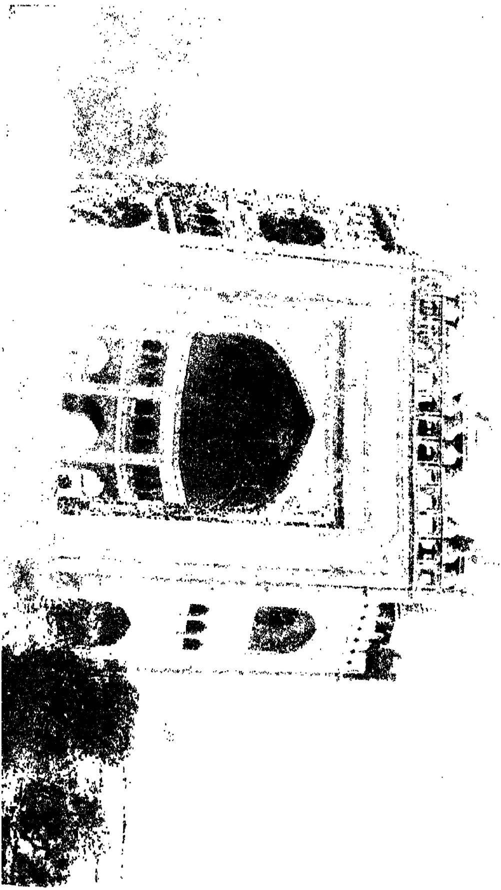
"হে সম্রাট্ কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিনী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ বিলাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,

ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগযুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

শনিবার রাত্রিতে আগরায় পৌঁছিয়াছিলাম। সমস্ত রবিবারটা তাজমহলের জন্যই রাখিয়া দিয়াছিলাম; প্রাতঃকালে তাজমহল,—মধ্যাহ্নে তাজমহল—অপরাহ্নকালে তাজমহল—রাত্রিতেও তাজমহল! সমস্ত দিনরাত ভরিয়া তাজমহল দেখিলাম; কিন্তু সে—

"——রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

—দেখিয়া আর আশ মিটিল না। প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী তাজমহলকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইলাম। পথে আসিতে আসিতে বারবারই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের লিখিত 'Passing of Shah Jahan'র নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে হইতে লাগিল—"Shah Jahan, retaining full consciousness to the last and gazing on the resting-place of his beloved and long-lost Mumtaz Mahal repeated the Muslim Confession of faith.-A moment later he



sank peacefully into eternal rest"—কি সুখের মরণ! তাজমহলের দিকে শেষদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে-করিতে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করা,—মনে করিলেও প্রাণের মধ্যে যে কি ভাবের সঞ্চার হয়, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

ফতেপুর সিক্‌রি

রবিবার রাত্রিতে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বলিলেন যে, পরদিন সোমবার প্রাতঃকালে আমার ফতেপুর সিক্‌রি দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমি পূর্ব্বেও দুই তিনবার আগরা গিয়াছি; কিন্তু একবারও ফতেপুর সিক্‌রি যাইবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই; যাঁহারা ফতেপুর দেখিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে উক্তস্থানের প্রশংসা করিয়াছেন।

আমার ভ্রমণের এই ব্যবস্থা হইল যে, খুব ভোরে আমার জন্য মোটর আসিবে;—এত ভোরে যে, আমরা আগরা হইতে যাত্রা করিয়া ২২ মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক যেন ঠিক সাতটার সময় ফতেপুর সিক্‌রিতে পৌঁছিতে পারি। তথাস্তু! স্থির হইল যে, চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ আমার সঙ্গে যাইবেন; আর পথি-প্রদর্শক হইবেন মহারাজের একজন কর্ম্মচারী। এখানেই বলিয়া রাখি যে, মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যাঁহাকে আমাদের

'গাইড' করিয়া দিলেন, তিনি কিন্তু আমারই মত পণ্ডিত। তিনি কোন দিন ও-মুখোও হ'ন নাই। মহারাজ আদেশ করিলেন সুতরাং তিনি 'যো হুকুম' বলিয়া সেলাম করিয়া আমাদের পথিপ্রদর্শক হইলেন। পৃথিবীতে অনেক সময়েই এমন হইয়া থাকে; কর্ম্মজগতেই হউক আর ধর্ম্মজগতেই হউক, অনেক সময়েই অন্ধ কর্ত্তৃক অন্ধ নীয়মান হইয়া থাকে। যাক্ সে কথা।

পরদিন সোমবার সাড়ে পাঁচটার সময় মোটরচালক আসিয়া উপস্থিত হইল। 'আমরা তখনও শয্যাগত। মোটরচালক আমাদিগকে ডাকিয়া তুলিল। তাহার নিকট শুনিলাম, একটু পূর্ব্বেই মহারাজ ঐ পথে বেড়াইতে যাইবার সময় আমাদের গৃহদ্বারে মোটর দণ্ডায়মান দেখিয়া চালককে 'জল্‌দি' করিবার জন্য আদেশ দিয়া গিয়াছেন। সংবাদটা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইলাম; মনে হইল 'যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়াপড়সির কাজ কামাই।' আমরা যাইব বেড়াইতে, আর তাহার জন্য ভোরের বেলা তাগাদা জুড়িয়া দিয়াছেন মহারাজা বাহাদুর।

তাড়াতাড়ি কোন প্রকারে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, বহুপূর্ব্বে আনীত চা পান করিয়া ফতেপুর সিক্‌রি যাত্রা করিলাম। বাইশ মাইল পথের মধ্যে যাহা যাহা দেখিলাম, তাহাদের দফাওয়ারি বিবরণ যদি সংগ্রহ করিয়া দিতে যাই, তাহা হইলে প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত হইবে। সে প্রলোভন আমি এই 'দশদিনে' পদে-পদে সংবরণ করিতেছি। কি ত্যাগ-স্বীকার! তবে ফতেপুর

সিক্‌রিতে কি কি দেখিয়াছিলাম, তাহার একটা ছোটখাট বিবরণ দিতেছি। বলিয়া রাখা ভাল যে, এক্ষেত্রে আমাদের যিনি গাইড, তিনি আমারই মত অভিজ্ঞ, সুতরাং সিক্‌রিতে পৌঁছিয়া যে ভাড়াটিয়া 'গাইড' পাইয়াছিলাম, সে যাহা-যাহা বলিয়াছিল এবং দেখাইয়াছিল, তাহাই বলিতে পারি। একটা কথা কিন্তু সকলেই মনে রাখিবেন যে, আমি ঐতিহাসিক নহি—প্রত্নতাত্ত্বিক ত নহি—নহি। সুতরাং আমি বাজার-প্রচলিত ইতিহাস হইতেই আমার কথা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। শেষে যে 'দশদিন' লেখা উপলক্ষে আমি ঐতিহাসিকগণের তীক্ষ্ণ লেখনীর আঘাতের বিষয়ীভূত হইব, তাহাতে আমি মোটেই রাজি নহি। কেতাবপত্রে ফতেপুর সিক্‌রি সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, তাহারই সারসংগ্রহ করিতে আসিয়াছিলাম ; কিন্তু দেখিলাম আমার দ্বারা এমন দুষ্কর্ম্ম কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না,—একেবারেই অসম্ভব। তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিলাম।

ফতেপুর সিক্‌রি সম্বন্ধে লিখিবার জন্য খানকয়েক ইংরাজী পুস্তক ওলটপালট করিতে-করিতে মনে হইল যে, বহুদিন পূর্ব্বে আমার সোদরপ্রতিম সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রে ফতেপুর সিক্‌রি সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেইটি যদি আমি তুলিয়া দিই, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয় ;—আমি একরাশি বাজে বই (নবেল ছাড়া আর সবই আমাদের মত পণ্ডিতের নিকট বাজে বই) পড়া

এবং তাহার সারসংগ্রহ করার দায় হইতে অব্যাহতি পাই। সহৃদয় পাঠক এবং উদারহৃদয়া পাঠিকাগণ দেখিতে পাইতেছেন যে, আমি ইতিহাসের বোঝা কেমন করিয়া বন্ধুগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতেছি। পরে ইহার আরও প্রমাণ পাইবেন। এখন ফতেপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবাবু কি বলিয়াছেন, তাহা শুনুন; আর বোঝাপড়া করিতে হয়, তাঁহার সঙ্গে করুন; —আমি খালাস!

"বহু শতাব্দীর পলিপড়া প্রান্তরের মধ্যে দেড়শত ফিট উচ্চ বালুকাময় প্রস্তরের গিরিমালার উপর ফতেপুর সিক্রি অবস্থিত। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম পর্য্যন্ত ফতেপুর সিক্রি প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। এখানে রাজধানী নির্ম্মাণের ও পরিত্যাগের কারণ জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইতে পারে। সে সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

আকবর শাহের সকল সন্তান শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, ইহার প্রতিকারকল্পে তিনি সপরিবারে আজমীরের প্রসিদ্ধ পীর মইনুদ্দীনের দরগায় গমন করেন। এই সুদীর্ঘ সাড়েতিনশত মাইল পথ আকবর সপরিবারে পদব্রজে অতিক্রম করেন। প্রতিদিন তিন ক্রোশ পরিমাণ পথ অতিক্রান্ত হইত। বাদশাহের অসূর্য্যম্পশ্যা শুদ্ধান্তঃবাসিনীকে লোকচক্ষুর পাপদৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্য পথের উভয়পার্শ্বে কাণাৎ (পর্দা) সংস্থাপিত

হইয়াছিল; আর কঠিন ধরণীতলস্পর্শে বাদশাহের, ততোধিক বেগমের কোমল পদপল্লবতল ব্যথিত হয়, সেইজন্য সমস্ত পথ কোমল কার্পেটে মণ্ডিত হইয়াছিল। দিবসের ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া, বাদশাহ ও বেগম যেখানে বিশ্রাম করিতেন, সেখানে একটি করিয়া ইষ্টকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইত।

দরগায় উপস্থিত হইয়া "হত্যা" দিলে রাত্রিকালে বাদশাহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইল যে, তাঁহাকে সিকৃরির ক্ষুদ্র শৈলশৃঙ্গবাসী শেখ সেলিম চিস্তির নিকট যাইতে হইবে। এই আদেশানুসারে আকবর শাহ সেই ছিয়ানব্বই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সাধু সেলিম চিস্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, সম্রাট্-মহিষী রাজা বিহারী মল্লের কন্যার গর্ভে আকবরের যে সন্তান জন্মিবে, সেই দীর্ঘজীবী হইবে। বেগম তখন গর্ভবতী; কাজেই তাঁহার সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত আকবর সপরিবারে সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১এ আগষ্ট তারিখে মহিষী একটি পুত্র প্রসব করিলেন; রাজ্যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। সেই সাধুপুরুষের নামানুসারে, আকবর শাহ পুত্রের 'মির্জ্জা সেলিম' নামকরণ করিলেন। এই মির্জ্জা সেলিমই ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত।

তখন সর্ব্বদা সাধুর অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আশায়, আকবর নির্জ্জন সিকৃরিতেই রাজধানী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। সাধুর নির্জ্জন বাসস্থান জনকোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল; সাধুর তপশ্চরণের

ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহার পর আকবর যখন সিক্রিতে রীতিমত দুর্গ-নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন, তখন সাধু বলিলেন, "যদি আমার ক্ষমতায় তোমার আর বিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার ও আমার একস্থানে বাস করা অসম্ভব। আমাকে এস্থান হইতে শান্তিতে বিদায় লইতে দাও।" এই কথা শুনিয়া আকবর বলিলেন, "তাহাই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে দাসকে অনুমতি করিলে দাসই অন্যত্র গমন করে।" তখন বৃদ্ধ সাধু আগরা সম্রাটের বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

রাজাকে লইয়াই রাজধানী; রাজার বাসস্থান-পরিবর্ত্তনে পূর্ব্ব রাজধানী শ্রীহীন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সম্রাটের আদেশে আগরার জনহীন প্রান্তর অচিরে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল; আর বন্যার জলের মত জনস্রোত ফতেপুর সিক্রি হইতে সরিয়া গেল। এখনও ফতেপুর সিক্রিতে সমুন্নত সৌধ ও প্রশস্ত পথ তেমনই রহিয়াছে; নাই কেবল নগরের জীবন, সৌধের সৌন্দর্য্য,—মানব। এখন সে পথে আর মানব-পদধ্বনি শ্রুত হয় না, বোধ হয় যেন আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত মৃত নগর; যেন কুশ-পরিত্যক্তা অযোধ্যা—

"যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশায়,
মুখর নূপুর চারু বাজিত চরণে;
আপনার পথ হেরি মুখের উল্কায়
সে পথে শৃগাল ঘুরে আমিষান্বেষণে।

খোদিত রমণীমূর্ত্তি স্তম্ভের উপর
ধূলায় বিবর্ণ হ'য়ে রয়েছে এখন ;
রক্ত অসিচর্ম্ম পড়ি আছে বক্ষোপর
উরস আবরি যেন রয়েছে বসন।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ও আরও অনেকের মতে পানীয় জলের অভাবই আকবরের ফতেপুর ত্যাগের কারণ।

ফতেপুরের বিশেষ বিবরণ

দক্ষিণদিক দিয়া প্রবেশ করিতে প্রথমেই 'বুলন্দ দরওয়াজায়' দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফারগুসনের মতে, ভারতবর্ষে, সম্ভবতঃ জগতে, আর কুত্রাপি কোন ধর্ম্মমন্দিরের এমন মনোরম দ্বার নাই।

বুলন্দ-দ্বারের পার্শ্বে একটি প্রায় ত্রিশ ফিট গভীর স্বচ্ছসলিল সরোবর আছে। দর্শকদিগের নিকট হইতে কিছু বক্‌শিস লাভের আশায় বালকগণ ও যুবকদল প্রায় সত্তর ফিট উচ্চ মসজিদ হইতে সেই সরোবর-সলিলে লাফাইয়া পড়ে। বুলন্দ-দ্বারের উপর আরোহণ করিলে, পরিত্যক্ত নগরী ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রান্তরের দৃশ্য নয়ন-সমক্ষে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়।

দ্বার অতিক্রম করিয়া সুবৃহৎ চত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশে বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন একটি মসজিদ অবস্থিত। প্রাঙ্গণের অপর তিন পার্শ্বেই

তীর্থযাত্রীদিগের জন্য রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। মসজিদটি তিনটি শ্বেত-মর্ম্মর-নির্ম্মিত গম্বুজের মুকুটে মণ্ডিত। মসজিদের দুই পার্শ্বের অংশ যাত্রীনিবাসের ন্যায় রক্তপ্রস্তরে গঠিত। মসজিদের মধ্যাংশ খিলান করা ও হর্ম্ম্যতল নানা-প্রকার জ্যামিতির চিত্রের মত চিত্রিত, সুন্দরীকৃত। মসজিদের প্রধান খিলানে লিখিত খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বুলন্দ-দরওয়াজা ইহারও বহুদিন পরে (১৬০১ খৃঃ) নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদের পশ্চাতে শেখ সেলিম চিস্তির শিশুপুত্রের সমাধি ও জাহাঙ্গীরের সূতিকাগৃহ। এখানে বসিয়া বৃদ্ধ সাধু আপনার ছাত্রদিগকে শিক্ষা-দান করিতেন।

চত্বরের উত্তরাংশে দুইটি সমাধি অবস্থিত। একটি রক্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত, অপরটি অমল-ধবল মর্ম্মরে গঠিত। ইহার বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ধবল প্রস্তরময় দেহ দূর হইতে সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যবহুল চিক্কণ বস্ত্রখণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয়। এই সমাধিটি শেখ সেলিম চিস্তির। এই সমাধি-মন্দিরাভ্যন্তরে শুক্তি-খচিত মর্ম্মর-আচ্ছাদনতলে তাঁহার দেহাবশেষ প্রোথিত। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, এবং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে এই সমাধি-নির্ম্মাণ শেষ হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এই মন্দির নানা বহুমূল্য প্রস্তরে সুশোভিত ছিল। জাঠগণ সেই রত্নরাজী লুণ্ঠন করিয়া মন্দির শ্রীহীন করিয়া যায়। অপর সমাধিটি সেলিমের

পৌত্র—জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী ইস্‌লাম খাঁর। অপর সমাধিটির সহিত তুলনায় ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে।

চত্বরের পূর্ব্বাংশে ষাটফিট উচ্চ বাদশাহী দ্বারপথে বাহির হইয়া সোপানাবলি অতিক্রম করিলে, আবুল ফজলের ও তাঁহার ভ্রাতা ফৈজীর সুগঠিত নিবাসগৃহে উপস্থিত হওয়া যায়। এই গৃহ এক্ষণে বিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার পরেই আকবরের প্রকৃত প্রাসাদাবলী। প্রথমেই অশ্বশালা। এখানে শতাধিক অশ্ব ও বহুসংখ্যক উষ্ট্র রাখিবার বন্দোবস্ত আছে; সাজসরঞ্জাম সকলই প্রস্তরের, তাই এতদিন পরে আজও কিছু নষ্ট হয় নাই!

তৎপরে যোধাবাইয়ের মহল। একটি অত্যুচ্চ কারুকার্য্যবহুল দ্বার অতিক্রম করিয়া এই মহলে প্রবেশ করিতে হয়। উত্তরে দক্ষিণে প্রস্তরের ছাদবিশিষ্ট অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ; এগুলি গাঢ় নীলবর্ণে অতি সুন্দররূপে মিনা করা। প্রাসাদ রক্ত-প্রস্তরে গঠিত; কাজেই এই বর্ণবৈচিত্র্য যে অত্যন্ত নয়নারাম, সে কথা বলা বাহুল্য।

যোধাবাইয়ের প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কতকগুলি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ; সে সকলের মধ্যে মন্ত্রিবর বীরবলের গৃহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহনির্ম্মাণে লৌহ বা কাষ্ঠ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই; কেবল রক্তবর্ণ বালুপ্রস্তরেই সমগ্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। গৃহের সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত;

—দেখিলে প্রস্তরের গঠন বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় যেন কোন জাপানী শিল্পী হস্তিদন্তের উপর নানা চিত্র খোদিত করিয়াছে। গৃহের উপরিতল কয়টি গম্বুজে শোভিত। এই গৃহ এক্ষণে দর্শকদিগের বিশ্রামাগারে পরিণত হইয়াছে।

প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে আর একটী প্রাসাদ আকবরের খৃষ্টান বেগম মরিয়মের প্রাসাদ বলিয়া লোকে অভিহিত করিয়া থাকে। এই প্রাসাদের দ্বারের উপরিভাগ বাইবেলে বর্ণিত নানা চিত্রে সুশোভিত; কিন্তু আকবরের পরবর্ত্তী গোঁড়া মুসলমানদিগের কৃপায় এখন তাহার অধিকাংশই বিনষ্টপ্রায়, শ্রীহীন। কেহ কেহ আকবরের খৃষ্টান-মহিষীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কিন্তু যখন তাঁহার খৃষ্টান মহিষী থাকা না থাকা উভয় পক্ষেই উপযুক্ত প্রমাণের অভাব, তখন এমন একটা মধুর জনশ্রুতিতে অবিশ্বাস করিয়া লাভ কি? বীরবলের ও মরিয়ম বেগমের গৃহের মধ্যে উদ্যানে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র মসজিদ অবস্থিত; বোধ হয়, অন্তপুরচারিণীবৃন্দ এখানে উপাসনা করিতেন।

ইহারই নিকটে প্রসিদ্ধ পঞ্চমহল। ইহার প্রথমতলে ছাপান্নটি স্তম্ভ; তন্মধ্যে কোনও দুইটির গঠন একরূপ নহে। দ্বিতলে পঁয়ত্রিশটি, ত্রিতলে পনেরটি ও চতুর্থতলে আটটি স্তম্ভ। সর্ব্বোপরি চারিটি স্তম্ভের উপর একটি গম্বুজ। এই পঞ্চমহলের কোন দুইটি স্তম্ভের মাতলার কারুকার্য্য একরূপ নহে। এই সুবৃহৎ



পঞ্চমহল—ফতেপুর ।

গৃহ শুদ্ধান্তশোভিনীদিগের সমীর-সেবনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহের দুইটি স্তম্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য; একটি স্তম্ভ দুইটি করিকরে বিজড়িত; অপরটিতে একজন মনুষ্য বৃক্ষ হইতে ফল চয়নে রত। কথিত আছে, শেষোক্তটি কোন বৌদ্ধ-মন্দির হইতে আনীত।

"খাসমহল" একটি প্রস্তরমণ্ডিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ-মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সরোবর,—পূর্ব্বে ইহাতে কয়েকটি ফোয়ারা ছিল। ইহার দক্ষিণে আকবর শাহের শয়নমন্দির। প্রকোষ্ঠভিত্তি ফার্সী রচনায় শোভিত; বলা বাহুল্য, তন্মধ্যে অনেকগুলিই বাদশাহের প্রশংসাসূচক।

এই খাসমহলের এক কোণে আকবরের তুর্কিপত্নীই স্তাম্বুলী বেগমের আবাসগৃহ। সমস্ত ফতেপুর সিক্‌রিতে এরূপ সুদৃশ্য প্রাসাদ অল্পই আছে। প্রাসাদাঙ্গে পশুপক্ষী প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃতিক চিত্র খোদিত। একাংশে একটি অতি সুন্দর আরণ্য-দৃশ্য চিত্রিত। স্তম্ভগুলিও নানা প্রকার খোদিত পত্রপুষ্পে শোভিত।

আর একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণপ্রান্তে "দেওয়ান-ই-খাস" অবস্থিত। হর্ম্ম্যতলে দশপঁচিশ খেলার ছক। এই অদ্ভুত অট্টালিকা-নির্ম্মাণের কোনও কারণই দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, ইহা একটি costly architectural freak মাত্র। বহির্দ্দেশ হইতে অট্টালিকাটি দ্বিতল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই সে ভ্রম অপনোদিত হইয়া যায়। হর্ম্ম্যতল হইতে

ছাদ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবধান নাই। গৃহের মধ্যস্থলে একটি সুবিশাল স্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে নানা চিত্র খোদিত। স্তম্ভশির হইতে প্রকোষ্ঠের চারি কোণ পর্য্যন্ত এক-একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতুবৎ পথ; প্রতি পথের শেষ হইতে হর্ম্ম্যতল পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী নামিয়া আসিয়াছে।

ইহার পর স্তম্ভশোভিত প্রাঙ্গণমধ্যে "দেওয়ান-ই-আম।" অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা বন্যপশুর ক্রীড়া-দর্শন ও তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

ফতেপুর সিক্‌রিতে আর একমাত্র উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা "আঁখমিছৌলি।" প্রদর্শকগণ বলেন, এখানে স্বয়ং আকবর শাহ পারিষদবর্গের সহিত "কাণামাছি" খেলা করিতেন। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ বলেন, উত্তর-কালে সমগ্র ভারতভূমি যাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল, সেই জাহাঙ্গীরের বাল্যক্রীড়ার জন্য এ গৃহ নির্ম্মিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা প্রাসাদের ধনাগার ছিল। দ্বারের গঠন দেখিলে এই শেষোক্ত মতই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। এই অট্টালিকার সম্মুখেই জৈনধরণে নির্ম্মিত সুন্দর ক্ষুদ্র হর্ম্ম্য।

এই প্রাসাদসমূহের বহির্দ্দেশে "হাতিপোল"। দুইটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তীর শুণ্ডদ্বয় জড়িত হইয়া এই দ্বার প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার এই নাম। কিন্তু আওরংজীব মুসল-

মানসুলভ প্রতিমাপূজাবিদ্বেষের আতিশয্যে হস্তিদ্বয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। যোধাবাইয়ের মহল হইতে হাতিপোলের উপরিস্থিত গৃহে আসিবার একটী আবৃত পথ আছে।

হাতিপোলের নিকটেই "হীরণ মিণার"। ইহার নিকট দিয়া মৃগাদি তাড়িত হইলে বাদশাহ তাহাদের শিকার করিতেন। ইহা সুরম্য নহে।

ফতেপুর সিক্রিতে এই সকল অট্টালিকা ভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রাণতোষিণী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অট্টালিকা অনেক বর্ত্তমান।

আকবর ফতেপুর সিক্রিতে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে দুর্গ সম্পূর্ণ না হইবার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হাতিপোলের নিকটেই সেই অসম্পূর্ণ দুর্গের নমুনা—"সাঙ্গিয়া বুরুজ"। এই বুরুজের নিকটেই রাজদরবারে পণ্যবিক্রয়-লোলুপ বণিকদিগের জন্য সরাই।

এখন এই সকল প্রাসাদ শ্মশানতুল্য নির্জ্জন। মোগল-গৌরবের এই প্রাণহীন অবশেষে আছে কেবল পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি। এখন এই বিজন প্রাসাদে শেখ সেলিম চিস্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত কতকগুলি প্রদর্শক বাস করে।"

ফতেপুর সিক্রির ইতিহাস বলা হইল; এক্ষণে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলিবার কিছু প্রয়োজন আছে কি? আমার ত মনে হয় না। তবে দুই একটী সামান্য কথা বলা দরকার মনে করিতেছি। প্রথম কথা এই যে, দেওয়ান-ই-খাসে যেখানে বসিয়া বাদশাহ

অমাত্যবর্গ লইয়া মন্ত্রণা করিতেন, আমি পরম উল্লাসে সেই-খানে বসিয়াছিলাম। কিন্তু অমাত্যবর্গ কোথায় পাইব? সেই স্থানে আমার সঙ্গী মহাশয় এবং পথিপ্রদর্শক ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না; সুতরাং দেওয়ান-ই--খাসে সম্রাটের আসনে বসিয়াও বাদশাহগিরী করা আমার অদৃষ্টে হইল না; লাভের মধ্যে এই হইল যে, আমার বহুদিনের সঙ্গী রৌদ্রোত্তাপ-নিবারক চস্‌মাখানি সেইস্থানে ফেলিয়া আসিলাম। বাদসাহের আসনে কি আর চক্ষে ঠুলী দিয়া বসা যায়! তাই আমি আমার চস্‌মাখানি খুলিয়া আসনের পার্শ্বে রাখিয়াছিলাম। তাহার পর সেই নির্জ্জন দেওয়ান-ই-খাসে বাদশাহগিরী করার পর যখন সেই স্থান ত্যাগ করি, তখন স্থানমাহাত্ম্যেই হউক বা আসনের মাহাত্ম্যেই হউক, সামান্য চস্‌মাখানির কথা আর মনে হইল না। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া চস্‌মার কথা যখন মনে হইল, তখন আবার সেই ২২ মাইল যাতায়াত করা অপেক্ষা চস্‌মার মায়া ত্যাগ করাই সঙ্গত মনে করিলাম। পাঁচ মিনিটের জন্য বাদশাহ-গিরী করিতে গিয়া ছয়টাকা মূল্যের চস্‌মাখানি হারাইয়া আসিলাম।

বাসায় আসিবার পর শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল; কোথায় কি দেখিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটির কথা বলিতে হইয়াছিল; সুধু বলি নাই আমার চস্‌মা হারাইবার গল্পটা,—সেটা তখন গোপন করিয়াছিলাম;

এখন এই 'দশদিনের' কল্যাণে আমার পাঁচ মিনিটের আবু-হোসেনগিরির কথাটা আর গোপন করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না।

সেকেন্দ্রা

সোমবারের প্রাতঃকালটা ত গেল ফতেপুর সিক্‌রিতে; অপরাহ্ণকালে গেলাম সেকেন্দ্রায়। ওটি আর এ যাত্রায় বাকী থাকে কেন? পূর্ব্বে যদিও দুই তিনবার সেকেন্দ্রায় গিয়াছিলাম; তবুও আগরায় আসিয়া সেকেন্দ্রায় না যাওয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই মনে হইল।

এবার সঙ্গী হইলেন শ্রীমান ললিতমোহন ও শ্রীমান রামেশ্বর-প্রসাদ। আগরায় আসিয়া প্রায় সকল রকম যানেই চড়া হইয়াছিল; হিসাব করিয়া দেখিলাম গো-যান এবং টমটমই বাকী আছে—একায় চড়িয়াছিলাম। গো যান আরোহণের কোনই সম্ভাবনা দেখিলাম না; কাজেই টমটমকেই এবেলা যানরূপে গ্রহণ করা স্থির করিলাম। আদেশমত একখানি টমটম আসিয়া হাজির হইল। আমরা সেকেন্দ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলাম; আগরার রাজপথের প্রচুর ধূলিরাশি মহানন্দে আমাদিগকে অভিনন্দন করিতে লাগিল।

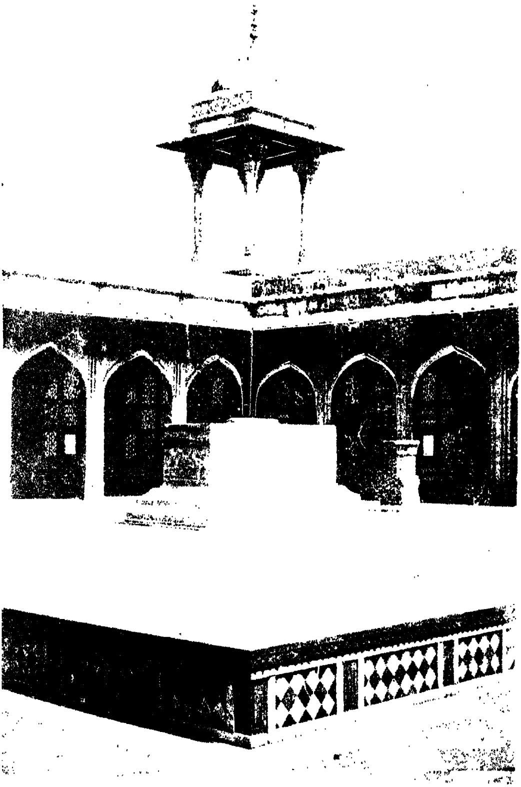
এইবার আবার ইতিহাস বলিতে হইবে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ

স্থানগুলির ঐ একটা মহৎ দোষ; সুধু এটা দেখিলাম, ওটা দেখিলাম, বাঃ বেশ, ইত্যাদি বলিলে আজকালকার দিনে চলে না ;—সে সকল স্থানের কোষ্ঠী-ঠিকুজী দিতে হয়। কাজেই আমাকেও নানা স্থান হইতে ধার করিয়া ইতিহাস বলিতে হইতেছে। কারণ, সেকেন্দ্রার ইতিহাস না বলিলে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামঞ্জুর—এক নাবালক ঐতিহাসিক এই মত দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিলেন। দশজনের মন রক্ষা করাই যখন এই বৃদ্ধবয়সে সঙ্কল্প করিয়াছি, সাবালকের কথাই হউক আর নাবালকের কথাই হউক, আমাকে কাজেই সেকেন্দ্রার ইতিহাস একটু বলিতেই হইতেছে। অতএব আপনারা 'যথাযোগ্য অধৈর্য্য সম্বল করিয়া' এই বহুবার-বহুজন-কথিত ইতিহাসের পুনরুক্তি শ্রবণ করুন।

সেকেন্দ্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোগল-সম্রাট্ আকবর চিরনিদ্রায় মগ্ন। এই সমাধিমন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে এবং কোন্ সময়ে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় ও কবে তাহা সমাপ্ত হয়, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। বর্ত্তমানে Ferguson সাহেবের সিদ্ধান্তকেই অনেকে গ্রহণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই সমাধিমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আকবর স্বয়ং আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যেই (১৬০৫-১৬১৫ খৃঃ) ইহার প্রবেশদ্বারগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। * Ferguson সাহেবের ন্যায়

---

* Hist. East. and Ind. Arch. (1876), pp. 583 ; 588, note I.



স্মিথ সাহেব * এবং Grigg সাহেবের গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা ভূমিকা-লেখকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। † ইঁহাদের মতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে এই সমাধি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়; কীন্ সাহেব (১) ও হ্যাভেল সাহেবও (২) এই মত প্রচার করিয়াছেন।

অপরপক্ষে Dr. Fuhrer বলেন, "Ferguson ভ্রমক্রমে এই সমাধিকে আকবরের নির্ম্মিত বলিয়াছেন; জাহাঙ্গীর ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।" (৩)

এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ গবেষণা করিতে চাই। পাণ্ডিত্য-প্রকাশের এমন সুযোগ কি ত্যাগ করিতে আছে? আপনারা অবধান করুন। যে সকল মহারথীর নাম করিলাম, তাঁহাদের কাহার কথা সত্য, তাহা এতদিন পরে স্থির করা যায় কি না, তাহার একটু চেষ্টা করিলে কি বিশেষ অপরাধ হইবে?

---

* Colour Decorations in Moghul Arch. E. W. Smith (1901), pp. 2, 20.

† One hundred Photographs and Drawings of Historical Buildings in India (1896) p. 1

(১) Handbook to Agra and its Neighbourhood (1902), p. 73.

(২) Agra and the Taj (1904), pp. 25, 77,

(৩) Ancient Monuments in the N. W. P. Arch. Sur. Ind

যে সমস্ত পর্য্যটক প্রথমে হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উইলিয়ম ফিন্‌চ অন্যতম। ফিন্‌চ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে আকবরের এই সমাধি পরিদর্শন করিয়া ইহার একটি বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন ইহা দেখিয়াছিলেন, তখন ইহার অবস্থা প্রায় বর্ত্তমানের অনুরূপই ছিল; কেবল প্রবেশ-দ্বারগুলির মধ্যে তখন একটি মাত্র নির্ম্মিত হইতেছিল। ফিন্‌চ লিখিয়াছেন "nothing were finished as yet, after *Tenne yeares* work" * (ইংরাজী বানান তাঁহাদেরই, আমার নহে) সেই বর্ষেই কাপ্তেন উইলিয়ম হকিন্স আকবরের সমাধির একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"It hath beene this *fourteene yeares* a building, and it is thought it will not be finished these seven yeares more, in ending gates and walls, and other needfull things, for the beautifying and setting of it forth." †

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে পিতার সমাধি-মন্দির পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্ম-কাহিনী 'Wakiat-i-Jahangiri'তে এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—

"১৭ই মঙ্গলবার (কোন মাসের উল্লেখ নাই) আমি পদব্রজে

* Purchas his Pilgrimes, 1. IV. 440 reprint, Vol. IV. 75

† Ibid I II 224; reprint 11?. 51

পিতার সমাধি-মন্দির দেখিতে যাই।......ইহা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার মনোমত বোধ হইল না। আমার ইচ্ছা ছিল,—ইহা এরূপ সুরম্য সৌধ হইবে যে, পর্য্যটকগণ যেন ইহা দেখিয়া না বলিতে পারেন যে, জগতে তাঁহারা এরূপ আর কোন সৌধ কখন দেখিয়াছেন। যখন ইহার নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল, তখন হতভাগ্য খসরুর বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আমি লাহোর গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইতোমধ্যে নির্ম্মাণকারিগণ, যে আদর্শে ইহা নির্ম্মাণ করিবার কথা ছিল, তাহার ব্যতিক্রম করিয়া তাহাদের নিজ অভিরুচি-অনুযায়ী ইহা নির্ম্মাণ করে। এইরূপে সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, এবং এই নির্ম্মাণকার্য্যে তিন-চারি বৎসরকাল গিয়াছে। যে অংশগুলি আপত্তিজনক বোধ করিয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য সুনিপুণ নির্ম্মাণকারীদের আদেশ করিলাম। এইরূপে অল্পে অল্পে চারিপার্শ্বে সুন্দর উদ্যান-পরিশোভিত এক বিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইল। শ্বেত প্রস্তরের Minaretযুক্ত এক সুবৃহৎ দ্বারও নির্ম্মিত হইল।" *

বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ যে এই সময়ে বাজার-গুজব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ তাহা না হইলে, একই বর্ষে দুইজন পর্য্যটক, সেকান্দ্রার নির্ম্মাণ-

* Elliot Muh. Hist. VI 319-20.

প্রসঙ্গে একজন দশ বৎসর, অপর জন চৌদ্দ বৎসরের উল্লেখ করিতেন না। অপরপক্ষে, যে সমস্ত গ্রন্থ জাহাঙ্গীরের আত্ম-কাহিনী বলিয়া পরিচিত, তন্মধ্যে 'Wakiat-i-Jahangiri'কেই Elliot ও Dowson সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে,—সেকান্দ্রার নির্ম্মাণকার্য্য আকবর আরম্ভ করেন নাই,—জাহাঙ্গীর করিয়াছিলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর ব্যস্ত থাকায় নির্ম্মাণকার্য্যের ভার তিনি নির্ম্মাণকারীদের উপরেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন,—এবং রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৬০৯ খৃঃ) তিনি ইহা পরিদর্শন করিবার পর, কয়েকজন সুদক্ষ নির্ম্মাণকারীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই সমাধির অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। ফিন্‌চ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে যখন ইহা দেখেন, তখন ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছিল এবং একটি প্রবেশদ্বারও নির্ম্মিত হইতেছিল।

প্রধান প্রবেশদ্বারে যে দুইটী খোদিতলিপি আছে, তাহা হইতে এই সমাধি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য কোন্ সময়ে সমাপ্ত হয়, তাহা জানা যায়। উদ্যানপার্শ্বে যে লিপিটী আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীর রাজত্বের ৭ম বর্ষে (নৌরোজ —১৭ই মার্চ্চ ১৬১২) ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করেন। ঐ স্থানে অপর যে লিপিটী আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বর্ষে -(নৌরোজ ৮ই মার্চ্চ ১৬১৩) ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়। কাজেই ১৬১৩-১৪

খৃষ্টাব্দে বা নির্ম্মাণারম্ভকাল হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে এই সমাধি-মন্দিরের সমস্ত নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল।

ফিন্‌চ ও হকিন্‌স উভয়েই প্রতিদিন তিন হাজার লোককে সেকান্দ্রা-নির্ম্মাণকার্য্যে রত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। যে সমস্ত প্রধান রাজমিস্ত্রী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল Calligraphist আব্‌দুল হক্ সিরাজী ব্যতীত আর কাহারও নাম জানিতে পারা যায় না।

কীন্ লিখিয়াছেন, "এই সৌধ নির্ম্মাণ করিতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।" * কিন্তু তিনি কোথা হইতে এই সংবাদটী পাইলেন, তাহার কোন নজীর উদ্ধৃত করেন নাই।

'ওয়াকিয়তে জাহাঙ্গীরিতে' লিখিত আছে—"এই সুবৃহৎ অট্টালিকার নির্ম্মাণকল্পে ইকাকের ৫০,০০০ তুমান এবং তুরাণের ৪৫ লক্ষ খানি † ব্যয়িত হইয়াছিল। মোগল সম্রাট্‌গণের মুদ্রার মধ্যে 'তুমান' ও 'খানি' আছে বলিয়া মনে হয় না; ইহা হয় ত তুর্ক বা পারস্যরাজগণের মুদ্রা হইবে; কাজেই ইহা কত ভারতীয় মুদ্রার সমতুল্য, তাহা বলিতে পারিলাম না।

কাপ্তেন হকিন্‌স লিখিয়াছেন যে, প্রতি বৎসরই আকবরের মৃত্যুদিনে সেকান্দ্রার সমাধি-মন্দিরে ভোজের আয়োজন হয়। তিনি লিখিয়াছেন—Upon this day there is great store

* Handbook p. 43

† Elliot, V1, 320

of victuals dressed and much money given to the poore." এই ভ্রমণকারীর মতে জাহাঙ্গীরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি ও তাঁহার সন্তানসন্ততিবর্গ এইস্থানে সমাহিত হইবেন; কিন্তু জাহাঙ্গীর লাহোরে 'শাহ্‌দারায়', শাহ্‌জাহান আগরার তাজে এবং আওরংজীব ইলোরা গুহার সন্নিকটে সমাহিত হন! ইহাই সেকেন্দ্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে সেকেন্দ্রার এই সমাধি-ভবন অতি যত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সমাধি-মন্দিরের দ্বারবান আমার সঙ্গী শ্রীমান ললিতের বিশেষ পরিচিত। এই বৃদ্ধ দ্বারবান বহুদিন এই কার্য্য করিতেছে; সে অনেক ইতিহাস বলিতে লাগিল। তাহার ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বা স্বকপোলকল্পিত কিছুই পাইলাম না। সে আমাদিগকে সমস্ত স্থান দেখাইল। অবশ্য তাহার সাহায্য না পাইলেও আমরা সমস্ত স্থানই দেখিতে পারিতাম, কারণ আমি নূতন যাত্রী নহি, আমার সঙ্গীও নূতন নহেন; তবুও এই বৃদ্ধ পথিপ্রদর্শককে ক্ষুণ্ণ করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

বাদশাহের সমাধি একখানি সুন্দর রেশমী আস্তরণে আবৃত রহিয়াছে; আস্তরণখানিতে সাচ্চার কাজ করা আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোগল বাদশাহের সমাধি-আচ্ছাদনের জন্য দুই-খানি আস্তরণ দান করিয়াছেন। আমরা যেখানি দেখিলাম,

সেখানি সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য; বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহারের জন্য যেখানি প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানি বহুমূল্য। আমরা যেদিন গিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর একসঙ্গে সেকেন্দ্রায় গিয়াছিলেন; সেই সময় সেই উৎকৃষ্ট আস্তরণখানির দ্বারা সমাধি আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। আমরা সাধারণ যাত্রী; আমরা আর সে আস্তরণ দেখিতে পাইলাম না। সমাধি-মন্দিরে আলো-প্রদানের জন্যও বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর একটী বহুমূল্য আলোকাধার প্রদান করিয়াছেন। সেটী আমরা দেখিতে পাইলাম।

অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ভ্রমণ করিয়া সম্রাটের সমাধিকে সেলাম করিয়া আমরা সেকেন্দ্রা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম এবং রাত্রিতে অপরাহ্নকালের ভ্রমণ-বিবরণ যথারীতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে জ্ঞাপন করিয়া সে রাত্রির মত বিশ্রাম করিতে গেলাম। সোমবারের কথা শেষ হইল।

কৈলাস

মঙ্গলবার—আজ রাত্রিতে আমরা আগরা ত্যাগ করিব। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজের ব্যবস্থা অনুসারে আজ আমরা সকলে কৈলাসে গমন করিব; মহারাজাধিরাজ বাহাদুরও আমাদের

সঙ্গী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কৈলাস-দর্শনই আমার এবার আগরা-আগমনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য; এই কৈলাস দেখাইবার জন্যই বর্দ্ধমানাধিপতি আমাকে সঙ্গী করিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে—তখন আমি আর এক মানুষ ছিলাম—সেই সময় একবার আমার মাথায় খেয়াল চাপিয়াছিল যে, দেবাদিদেব মহেশ্বরের কৈলাস দর্শন করিতে যাইব। তাই উদ্ভ্রান্তচিত্তে হিমালয়ের মধ্যে কৈলাসের পথ খুঁজিয়াছিলাম। তখন মনে করিয়াছিলাম, শরীরে শক্তি আছে; মৃত্যুর ভয় নাই; সুতরাং 'আমি' চেষ্টা করিয়া কৈলাস-ধামে যাইব;—প্রকাণ্ড একটা 'আমি'র অহঙ্কারে, দর্পে অধীর হইয়া, 'আমি'কে পথিপ্রদর্শক করিয়া কৈলাসে যাইব। হায়, তুচ্ছ, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 'আমি'! সেই 'আমিত্বের' দর্প যখন চূর্ণ হইয়া গেল, অভ্রভেদী হিমালয় যখন তুষার-প্রাচীর দ্বারা পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম—পথ মিলিল না। তখন যদি বুঝিতে পারিতাম যে,যে পাথেয় লইয়া আমি কৈলাস-দর্শনে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তাহা অতি অকিঞ্চিৎ-কর,—তাহা সম্বল করিয়া ও-পথে যাওয়া যায় না,তাহা হইলে হয় ত জীবনের গতি ফিরিয়া যাইত, হয় ত প্রকৃত পাথেয় মিলিত, হয় ত পরে কৈলাস দর্শন হইত! কিন্তু তাহা যে হইবার নয়; তাই একেবারে ফিরিয়া আসিলাম,—একবার কাতরপ্রাণে কৈলাসে-শ্বরকেও ডাকিলাম না।

সে কৈলাস দর্শন হইল না। এ জন্মে হইল না;—কবে হইবে,

কত যুগযুগান্ত, জন্মজন্মান্তর পরে হইবে, কে জানে? সেইজন্যই বহুকালপরে মহারাজাধিরাজ সে দিন যখন কৈলাস দর্শন করাইবার জন্য আমাকে সঙ্গী করিতে চাহিলেন, তখন সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া আমি তাঁহার সঙ্গী হইলাম। আমার যে পাথেয় নাই, তাহা আমিও জানিতাম, তিনিও জানিতেন; কিন্তু আমি এবার পাথেয় সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হই নাই; সে ভার যিনি গ্রহণ করিলেন, তিনি তাঁহার রাজভাণ্ডারের অবস্থা বুঝিয়াই আমার ভার লইয়াছিলেন;—আমি ব্যস্ত হইব কেন?

আমার একটা কথা বড়ই মনে হইয়াছিল; সে কথাটা এখানে বলিয়া রাখি। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আমাকে যখন 'কৈলাস দর্শনে' যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, তখন আমার মনে বড়ই একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। যখন আমি সব ছাড়িয়া, কম্বল-সম্বল করিয়া হিমালয়ে গিয়াছিলাম;—যখন শারীরিক কষ্ট যথেষ্ট উপেক্ষা করিয়াছিলাম;—যখন নিতান্ত দীন-দরিদ্রের বেশে কৈলাস-দর্শনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলাম; যখন একটী পয়সাও সম্বল ছিল না; তখন আমার অদৃষ্টে কৈলাস-দর্শন হইল না; আর এতকাল পরে, এই ঘোর-বিষয়াসক্ত, এমন স্বার্থপর, এত কলুষকলঙ্কিত আমার অদৃষ্টে কৈলাস-দর্শনের সুযোগ হইতে চলিল কেন? সুধু কি সুযোগ, —একেবারে রাজযোগ! আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, তখন কৈলাস হিমালয়ের অপর-পারে ছিল; তখন কৈলাসের পথরোধ করিয়া নগাধিরাজ হিমালয় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; তখন চিরতুষাররাশি

আমার গমনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল; আর এখন কি না সেই কৈলাস হিমালয় ত্যাগ করিয়া আগরার অদূরে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত মহম্মদ পর্ব্বত-সমীপস্থ না হওয়ায় পর্ব্বতই না কি মহম্মদের সমীপস্থ হইয়াছিলেন! হজরত মহম্মদের নিকট পর্ব্বত আসিতে পারে—মহম্মদ যে মহাপুরুষ! কিন্তু আমি কে? আমি সংসারাসক্ত, নরকের কৃমিকীট, স্বার্থের দাসানুদাস;—আমার জন্য কৈলাস আসিবে কেন? আসিবে কেন, আসিল কেন, তাহা জানি না; কিন্তু আমি কৈলাস-দর্শনের সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়াই মহারাজাধিরাজের সঙ্গী হইয়াছিলাম।

আজ মঙ্গলবার সেই কৈলাস-দর্শনে যাইব। পূর্ব্বদিন রাত্রিতেই সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছিল। রাত্রিশেষে মহারাজের অনুচরগণ কৈলাসে গমন করিবে; তাহারা সেখানে আমাদের আহারের আয়োজন করিবে। মহারাজ এবং আমরা সকলে কৈলাসে সেদিন চড়ুইভাতি করিব। প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহারাজ এক মোটরে কৈলাসে যাইবেন; আমি এবং আমার সঙ্গী মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতমোহন দাস, মহারাজের চিকিৎসক শ্রীমান নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মহারাজের চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ—এই চারিজন দ্বিতীয় মোটরে যাইব।

কৈলাস দেখিতে যাইব, বহুদিনের আশা-পূর্ণ হইবে, এই সমস্ত কথা ভাবিতে-ভাবিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল। ঐ বুঝি রাত্রি শেষ

হইল, ঐ বুঝি প্রভাতের পাখী ডাকিল, ' ঐ বুঝি আমাদের মোটর আসিল ;—এই রকম উদ্বেগে আমি সারারাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হয়, তাহাই হইল ; ভোরের সময় আমি ঘোর তন্দ্রামগ্ন হইলাম। শ্রীমান ললিত-মোহন ও ডাক্তার নন্দলাল প্রস্তুত হইয়া আমার বাসায় আসিয়া দেখেন, আমি শয্যাত্যাগ করি নাই। ডাক্তার নন্দলাল সুগায়ক ; তিনি তখন আমার নিদ্রাভঙ্গের জন্য গান ধরিলেন—

"হারে রে, রে, রে রে উঠরে কানাই,
বেলা হ'ল চল, চল গোঠে যাই।"

নন্দলালের সেই মধুর গীতধ্বনিতে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল ; চাহিয়া দেখি আমার শয্যাপার্শ্বে নন্দলাল ও ললিতমোহন। ললিতমোহন বলিলেন, "এই বুঝি দাদার ভোরে নিদ্রাভঙ্গ! উঠুন, উঠুন, মহারাজ প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বে চ'লে গেছেন।" আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, "তোমার মহারাজ ত আর রাত্তিরে ঘুমান না?" ললিত বলিলেন, "তিনি কি তবে সারারাত্রি জেগে থাকেন?" আমি বলিলাম, "সারারাত্তির জাগে দুই-জন—এক চোর, আর সাধক। মহারাজ তোমাদের একাধারে দুই-ই। আমি সাধক ত নই-ই, তোমার মহারাজের মত চোরও নই।" নন্দলালের গান আট্‌কায় না ; তিনি অমনি গান ধরিলেন—

দশম দিন

"আয় দেখি মন চুরী করি,
ওরে, তোমায় আমায় একত্র রে;
শিবের সর্ব্বস্বধন শ্যামা-চরণ
যদি আন্‌তে পারি হরে'।"

ললিত বলিলেন, "এখন উঠুন, পাকা সাতটী মাইল যেতে হবে!" আমি বলিলাম "প্রাতঃকৃত্য!" উত্তর হইল "প্রাতঃকৃত্য, তৈজসপত্র, খুঙ্গীপুঁথি, সব সেখানে হবে।" এই বলিয়া ললিতমোহন আল্‌নার উপর হইতে একখানি কাপড় একখানি তোয়ালেতে জড়াইয়া লইলেন; আমি হাতেমুখে একটু জল দিবারও অবকাশ পাইলাম না; একখানি মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। গেটের নিকটেই আমাদের মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা চাপিয়া বসিলাম। মোটর বিকট শব্দ করিয়া কৈলাস-উদ্দেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

আমরা যে কৈলাস-দর্শনে যাইতেছি, তাহা আগরা হইতে সাত মাইল দূরে যমুনাতীরে অবস্থিত। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' মহামতি সম্রাট্ আকবর শাহের নশ্বরদেহ যেখানে সমাধি-শয্যায় রহিয়াছে, সেই সেকেন্দ্রার সম্মুখ দিয়া যে রাজপথ চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া কিছুদূর গমন করিলেই দক্ষিণ পার্শ্বে আর একটী প্রশস্ত পথ পাওয়া যায়; সেইটি কৈলাসের পথ। সেই পথে কিছুদূর গেলেই যমুনাতীরে কৈলাসে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই স্থানের নাম কৈলাস কেন হইল, কে এ স্থানে প্রথম আশ্রম

প্রতিষ্ঠা করেন, এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এবং এখানকার জনশূন্য শৈলমালা সাধনার উৎকৃষ্ট স্থান মনে করিয়া কে এখানে সর্ব্বাগ্রে আগমন করিয়াছিলেন, এখানে যমুনাতীরে যে একটী ধরমশালা আছে, তাহাই বা কে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এ সকল তথ্য-সংগ্রহের কোন চেষ্টাই আমি করি নাই, চেষ্টা করিবার কোন প্রয়োজনও অনুভব করি নাই ; কারণ আমি ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে বসি নাই ; আমি ত পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য সেখানে যাই নাই। আমি দেখিতে গিয়াছিলাম যে, যে স্থানকে কৈলাস নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা আমার কল্পনার কৈলাসের সহিত মিলে কি না? দেবাদিদেব মহেশ্বরের কৈলাসের অনেক বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, অনেক দৃশ্য আবার মনে-মনেও গড়িয়া লইয়াছিলাম ; এই কৈলাসে তাহার কিছু আছে কি না, তাহাই দেখিবার ইচ্ছা আমার প্রবল হইয়াছিল। আরও এক কথা। যে আদি কৈলাস আমি দেখিতে যাইতে পারি নাই, এ জীবনে আর পারিব না ; সেই কৈলাসের নামগ্রহণ করিয়া যে স্থান আগরার অদূরে অবস্থিত, তাহা দর্শন করিলেও যদি ক্ষণেকের জন্য আমার বাসনা কিঞ্চিৎ চরিতার্থ হয়, তাহা হইলেও আমার যাত্রা বিফল হইবে না!

আমাদের মোটর যখন কৈলাসের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তখন দেখিতে পাইলাম আমরা লোকালয় হইতে দূরে আসিয়াছি। সম্মুখে কতকগুলি ছোট-ছোট প্রস্তর-মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাইলাম।

এগুলিকে মৃত্তিকাস্তূপ না বলিয়া শৈলমালা বলিলেই ঠিক কথা বলা হয়। দেখিতে-দেখিতে আমাদের মোটর এই শৈলশ্রেণীর নিকটস্থ হইল। সঙ্গীরা বলিলেন, মোটর আর অগ্রসর হইতে পারিবে না; আমাদিগকে এই স্থান হইতে পদব্রজে মহারাজাধিরাজের আশ্রমে উপস্থিত হইতে হইবে। মোটর ত্যাগ করিয়া, তখন আমরা পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া যে অপ্রশস্ত নূতন পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই আঁকাবাঁকা পথে চলিতে লাগিলাম; কিঞ্চিৎ চড়াই উৎরাইও ভাঙ্গিতে হইল। তাহার পরেই দেখিলাম, অদূরে একটী টিলার উপরিভাগে মন্দিরের মত একটা প্রস্তরনির্ম্মিত অতিক্ষুদ্র গোলাকার গৃহ; তাহার ছাদের উপরে চারিপার্শ্বে কয়েকটী ক্ষুদ্র স্তম্ভ; তাহার উপরে একটা প্রস্তরের আচ্ছাদন। সেই আচ্ছাদনের নিম্নে ঠিক ছাদের মধ্যভাগে একখানি প্রস্তরের আসনের উপর গরদের বস্ত্র পরিধান করিয়া মহারাজ বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে একজন গৈরিক-পরিহিত বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপবিষ্ট এবং পার্শ্বে রাখাল দাদা রহিয়াছেন। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-সোপান অতিক্রম করিয়া সেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে মহারাজ আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি উপরে উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বেই বসিলাম। তিনি সন্ন্যাসীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি প্রণাম করিলে সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর মহারাজ সন্ন্যাসীর সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন।

আমি আর সেখানে বসিয়া কি করিব? ধর্ম্মালাপ শুনিবার জন্য ত আমি সেখানে যাই নাই। আমাকে সেই স্থানের পবিত্র শান্ত দৃশ্যই অধিক আকর্ষণ করিতে লাগিল।

কি সুন্দর, কি মনোরম, কি পবিত্র সেই স্থান! সেই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়াই যমুনা প্রবাহিত হইয়াছেন। যমুনার জল ধীরে-ধীরে চলিয়া যাইতেছে; অপরপারে দূরবিস্তৃত বালুকাময় তীরভূমি; তাহার প্রান্তে অরণ্যের শ্যামশোভা। কবি নহি, চিত্রকর নহি, ভাবুকও নহি। হায়! দেখিবার মত চক্ষুও নাই;—কলনাদিনী যমুনার আহ্বানবাণী শুনিবার মত কর্ণও নাই। আমি সে স্থানের কি বর্ণনা দিব?

তবুও দেখিয়াছিলাম—নয়ন-মন এক করিয়া সেই পবিত্র আশ্রমভূমির, সেই দূরবিস্তৃত শৈলমালার, সেই কলনাদিনী যমুনার স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম! যমুনা দর্শন করিয়া সুধুই মনে হইতেছিল—

"যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও যার, বিমল তটে, রূপের হাটে
বিকাত নীলকান্তমণি।"

এতদিনে বুঝিতে পারিলাম, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ভারতবর্ষে এত স্থান থাকিতে এই আগরা সহরে বাস করিতে এত ভালবাসেন কেন? একটু অবকাশ পাইলেই

দৌড়াইয়া আগরায় আসেন কেন? এখানে, এই কৈলাসে তিনি আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এখানে আসিয়া তিনি নিশ্চয়ই শান্তি পান; তাই কর্ম্মকোলাহল দূরে পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন শৈলশৃঙ্গে ছুটিয়া আসেন।

আমি যখন মহারাজের পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া নীচে নামিলাম, তখন তিনি আমাকে মন্দিরের মধ্যে যাইতে বলিলেন। আমি অতি সঙ্কুচিতভাবে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করি কি না; যে মন্দির নির্ম্মাতার সাধনার স্থান, আমি সেখানে প্রবেশ করিয়া তাহার পবিত্রতা নষ্ট করিব কি না। আমার সেখানে, সে দেব-মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আছে কি? মহারাজ যেন মন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন; কিন্তু মহারাজের যিনি মহারাজ, তিনি যদি আমাকে ফিরাইয়া দেন;—তিনি যদি বলেন "দেবদর্শনের জন্য কি অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছ, দেখাও?" তাহা হইলে আমি কি দেখাইব?

এই মনে করিয়াই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। মহারাজ তখন উপর হইতে বলিলেন, "ভিতরে গিয়ে দেখুন না।" তখন আর তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না; মনে করিলাম রাজরাজেশ্বরের আদেশ না পাইলেও তাঁহার প্রতিনিধির আদেশ ত পাইলাম। তখন মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

মন্দিরমধ্যে কোন দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম না;

পূজারও কোন উপকরণ দেখিলাম না। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য কিছুই নাই; পুষ্পাধারও নাই, সিংহাসনও নাই, পূজামঞ্চও নাই। মন্দিরে দেবতার মৃৎ বা প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি না থাকিবার এক কারণ তখন ভাবিয়া পাইয়াছিলাম, আর এক কারণ এখন পাইয়াছি। তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, পাপমলিন হৃদয়ে তখনও বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম যে, এ নির্জ্জন দেবমন্দিরে কোন মূর্ত্তির প্রয়োজনাভাব। যাঁহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এখানে অমূর্ত্ত অবস্থায় সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন; প্রত্যেক শিলাখণ্ডে সেই অরূপীর নয়ন-মন-বিমোহন রূপ প্রতিফলিত রহিয়াছে। 'প্রতীকের' যে এখানে প্রয়োজনাভাব! এখানে তিনি স্বপ্রকাশ! আমি দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ছিল, তাই সেই দেবাদিদেবের সত্তা অনুভব করিতে পারিলাম। কৈলাস-দর্শনে আসিয়া ইহাই আমার পরম লাভ। যেখানে আসিলে মহারাজাধিরাজের ছত্রদণ্ড ধূলায় লুণ্ঠিত হয়, সেখানে আমাদের শূন্যগর্ভ গর্ব্ব-পরিপূর্ণ মস্তক অবনত হইবে না কেন? তখন বুঝিলাম, কাঙ্গাল হরিনাথ কেন কাঁদিয়াছিলেন—

"যদি ডাকের মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন ক'রে
তুমি লুকিয়ে থাক্‌তে পারতে।"

যিনি ডাকার মত ডাকিতে পারেন, তাঁহার কাছে কি তিনি ধরা না দিয়া পারেন? তাঁহার হৃদয়মন্দিরে সেই চিন্ময় দেবতার প্রকাশ না হইয়া কি পারে? আমি এই কৈলাসে আসিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। সত্যসত্যই কৈলাসের সেই দেবমন্দির অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ; অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা তাহার প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে মিশিয়া রহিয়াছে।

অনুভূতির কথা বলিলাম, এখন যাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছি, তাহার কথাও একটু বলি। সেই দেবমন্দির একেবারেই সজ্জিত নহে; বাহ্যিক সজ্জার কোন প্রয়োজন নাই, বুঝিতে পারিয়াই বিজয়ানন্দজি এ মন্দির স্থুধু আনন্দ দিয়াই ভরিয়া রাখিয়াছেন। সেই আনন্দের হিল্লোলেই এই মন্দির পুলকিত। অনেক দিন পূর্ব্বে এক রাতভিখারীর মুখে একটা গান শুনিয়াছিলাম। সে গানের গোড়াটা মনে নাই, কিন্তু একটা অন্তরা আমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। এই আনন্দনিকেতন, এই বিজয়ানন্দ-নিকেতন, এই বিজয়ানন্দাশ্রম দর্শনে বারবারই সেই গানটা আমার মনে পড়িয়াছিল—

"সেথা আনন্দ-শাখীতে পাখী আনন্দ-সঙ্গীত গায়,
আনন্দময় ফুল ফল তায় বহিছে আনন্দ-বায়;
নিত্যানন্দধাম সে যে, কিছু নাই আনন্দ বই,
পিতা সদানন্দ আমার, মাতা যে আনন্দময়ী;

যদি কারু লাগে ক্ষুধা,
খেতে দেন আনন্দসুধা ;
তাইতে দ্বিজ গোবিন্দের আজ এত আনন্দ মরণে।"

দ্বিজ গোবিন্দ সত্যসত্যই বলিয়াছেন, এমন আনন্দের হাটে মরণে বড়ই আনন্দ! এই আনন্দনিকেতন দর্শনেও আমার সেই কথাই মনে হইয়াছিল; মনে হইয়াছিল, হায় কি পুণ্য করিলে এই বিজয়ানন্দ-আশ্রমে আনন্দ-সঙ্গীত-শুনিতে-শুনিতে, আনন্দময়ের নাম করিতে-করিতে আনন্দধামে চলিয়া যাওয়া যায়। কি পুণ্যে —কি সাধনায়? ও গো বলিয়া দাও, কি মূল্যে এই সাধের মরণ ক্রয় করা যায়? এখানে আসিলে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। বাঁচিয়া থাকিলে যে আমাদের অনেক জ্বালা,—আনন্দ উপ-ভোগের যে অনেক বিঘ্ন। তার চাইতে আনন্দসাগরে ডুবিয়া মরাই প্রার্থনীয়।

থাকুক সে কথা। মন্দিরের কথা বলি। মন্দিরে কোন সাজসজ্জা নাই, কোন দেবতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার এক কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর একটা কারণ পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অল্প কয়েক-দিন হইল একখানি ইংরাজী পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার নাম "Meditations।" সেই পুস্তকের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"The scene changes—I am in a Shi-

valaya. Strings of temples of white marble, but not a soul in it! I shudder. I am lost in reverie. I think, I pray again, and the answer is 'Get ready to have a fight with sorrow and grief—with struggle and strife—these are only foreshadows. Do you not see why I showed you these Temples, but no devotees? Because, that is how they worship me. They only pray to these symbols, not to me—hence their prayers are soulless, temples lifeless.' I see the sign and bow." মহারাজাধিরাজের এই কথাতেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের কথা বুঝিতে পারিয়াছি।

মন্দিরে সাজসজ্জা নাই, দেবমূর্ত্তি নাই। তবে আছে কি? যাহা আছে, তাহা পূর্ব্বে একটু বলিয়াছি। এখন যাহা চক্ষে দেখিলাম, তাহাই বলি। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখি দুই পার্শ্বে দুইটি দ্বার। সেই দ্বারের সম্মুখেই দুইটা সোপানশ্রেণী ভূগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। সেই সোপানাবলি দিয়া নামিয়া ভূগর্ভে দুইটী গুহা। গুহার মধ্যে কেবল একখানি করিয়া সামান্য আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। আর কিছু নাই—আর কিছু চর্ম্মচক্ষে দেখিবার নাই। আমি আর কিছু দেখিতে পাই নাই। যিনি এই গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি এই গুহায় সময় অতিবাহিত করেন, তিনিই

বলিতে পারেন, এই ভূগর্ভে অন্ধকারময় অপ্রশস্ত গুহায় আর কি আছে? কি আছে, যাহার জন্য ধনজন-ঐশ্বর্য্যবেষ্টিত মহারাজ এই অন্ধকার গহ্বরে দিনাতিপাত করেন।

গুহা দর্শন হইল,—দেবদর্শন হইল না। এমন সময় দ্বারের নিকট হইতে শব্দ আসিল "আসুন"। আমি কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম মহারাজাধিরাজ আহ্বান করিতেছেন;—কিন্তু চাহিয়া দেখিলাম—বিজয়ানন্দ! আমার এই দেবমন্দির এবং এই কৈলাস-দর্শন এই স্থানেই শেষ হইল। যাহা অনীর্ব্বচনীয়, তাহা বলিবার চেষ্টা করিয়া কি করিব?

মন্দির হইতে বাহিরে আসিলাম। তখন সকলে মিলিয়া আর একটি আশ্রম, আর একটি মন্দির দেখিতে গেলাম। মহারাজের এই মন্দির যে শৈলশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, অপর মন্দির বা আশ্রম তাহা হইতে কিছু দূরে আর একটি শৈলশৃঙ্গে নির্ম্মিত হইয়াছে,—মহারাজই নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্যই এই আশ্রমটি নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু তিনি এখন এই আশ্রমচ্যুত। পূর্ব্বে যে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছি, এখানে এখন তিনিই সশিষ্য বাস করেন। আমরা খানিকটা পথ ঘুরিয়া এই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কয়েকটী সন্ন্যাসী এই আশ্রমে রহিয়াছেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি একটু পিছনে পড়িয়াছিলাম। আমি যখন সেই আশ্রমদ্বারে

উপস্থিত হইলাম, তখন আমার আর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না। দ্বারের নিকট হইতেই চাহিয়া দেখিলাম, প্রকোষ্ঠের মধ্যে কতকগুলি হাঁড়ি সাজান রহিয়াছে। আরে, হাঁড়ি!—তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর নাই। কৈলাসে আসিলাম—তবু হাঁড়ি সঙ্গেই আসিয়াছে। এই হাঁড়ি যে লোকালয়ে ফেলিয়া আসিয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। হাঁড়ির চিন্তাতেই ত এত-দিন কাটিয়া গিয়াছে। সামান্য এক দণ্ডের জন্য যে হাঁড়ির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেই হাঁড়ি আগের খেয়ায় পার হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে! হায়! হাঁড়ি, তুমি আমার সঙ্গ কি ত্যাগ করিবে না? তাই এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের স্কন্ধে ভর করিয়া তাঁহাদের সাধনাশ্রম দখল করিয়া বসিয়া আছ? বুঝিলাম গৃহী হইলেও হয় না, সন্ন্যাসী হইলেও হয় না;—হাঁড়ি সহজে সঙ্গ ছাড়ে না। তখন কাঙ্গাল হরিনাথের সেই গানটি আমার মনে পড়িল—

বৈরী জটিলা কুটিলা আমার বাসনা।
আমি মনেতে করি, গৃহ সাধন-অরি,
বনে যাব, নাম করিব দিবা-সর্ব্বরী;
কিন্তু, বাসনা থাকিলে মনে বনে গেলেও যন্ত্রণা।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না; বিষণ্ণ মনে সে স্থান ত্যাগ করিলাম; পঙ্কমলিন হৃদয়কে যদি বা একটু

থিতাইয়া লইয়াছিলাম, এই দৃশ্য দেখিয়া আবার তাহা পঙ্কিল হইয়া গেল; ক্ষুদ্র হৃদয় আবার ক্ষুদ্রতায় পরিপূর্ণ হইল। আমার এই ভাবপরিবর্ত্তন মহারাজের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তিনি আমাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন চুপ করে গেলেন কেন?" আমি বলিলাম "এ আশ্রমটী আমার ভাল লাগিল না।" তিনি আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন; তাই বলিলেন, "আমিও তা বুঝতে পেরেছি; অনেকগুলো নানাভাবের লোক এসে স্থানটাকে গোল করে দিতে বসেছে।"

তাহার পরই মহারাজ স্নান করিতে গেলেন; আমরাও, যেখানে আমাদের আহারের আয়োজন হইতেছিল, সেইস্থানে গেলাম। মহারাজ পূর্ব্ব রাত্রিতে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, কৈলাসে সকলে মিলিয়া চড়ুইভাতি করা হইবে। আমি মনে করিয়াছিলাম, মহারাজ রন্ধন করিবেন, আমরা জল টানিব, কাঠ কুড়াইব, বাঁটনা বাঁটিব, তরকারী কুটিব,—বেশ চড়ুইভাতি হইবে। কিন্তু মহারাজ এ আনন্দ সম্ভোগ করিতে দিলেন না, রাজহস্তের রাঁধা খিচুড়িভোগ পাইবার সৌভাগ্য হইল না। দেখিলাম, একদল ভৃত্য, রাঁধুনী ও কর্ম্মচারী আসিয়া রাজ-ভোগের আয়োজন করিয়া বসিয়াছে। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। আমি গরিব মানুষ, গরিবের মত চড়ুইভাতি হইবে বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু এ চড়ুইভাতির উদ্যোক্তা যে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ,—কৈলাসের বিজয়ানন্দ নহেন!

তখন বুঝিলাম, এই যমুনাতীরে মহারাজ আমাদের জন্য রাজোচিত চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমরা তখন সকলে মিলিয়া যমুনায় অবগাহন করিলাম। তাহার পর মহারাজকে লইয়া ভোজন। মহারাজের ব্যবস্থিত চড়ুইভাতির একটা বর্ণনা দিব কি? আমরা ছেলেবেলায় চড়ুইভাতি করিতাম। সে এক ব্যাপার! হৈ হৈ কাণ্ড! সকলের প্রাণান্ত পরিশ্রমে অপরাহ্ণ তৃতীয় প্রহর গতে আমরা চড়ুইভাতির খিচুড়ি আহার করিতাম; হয় ত খিচুড়ির ডাইল গলিয়া একেবারে অস্তিত্বশূন্য হইয়াছে, এদিকে চাউলগুলি মোটেই সিদ্ধ হয় নাই; আলুভাজা হয় ত কাঁচা আছে, বেগুনপোড়া হয় ত দগ্ধ অঙ্গারবর্ণ হইয়াছে; শাকের ঘণ্ট হয় ত লবণে পুড়িয়া গিয়াছে। আর আমরা সেই সকলই পরম উপাদেয় জ্ঞান করিয়া পরমানন্দে আহার করিয়াছি; একটুও ক্লেশবোধ হয় নাই, অজীর্ণও হয় নাই। আর মহারাজের এই চড়ুইভাতিতে সে সব কিছুই নাই। উৎকৃষ্ট পুরী, নানা-উপাদেয় মস্‌লা-সমন্বিত পোলাও, বহুবিধ নিরামিষ তরকারী, (আমিষের সম্বন্ধও সে দিন ছিল না) তাহার পর দধি ক্ষীর পায়সান্ন, নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফলমূল। ইহার নাম রাজভোগ—চড়ুইভাতি নহে। সে যাহাই হউক, তাহাতে প্রকৃত ব্যাপারের কিছুই বিঘ্ন হইল না। এই বিপুল আয়োজনের যথারীতি সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা জয়ধ্বনিপূর্ব্বক কৈলাস ত্যাগ করিলাম এবং অপরাহ্ণকালে

বাসায় আসিয়া এই গুরুতম চড়ুইভাতির জের মিটাইতে আমাদের সন্ধ্যা হইয়া গেল। তথন যাত্রার আয়োজন করিতে হইল। রাত্রি দশটার সময় তিন দিনের প্রবাসস্থান আগরা ত্যাগ করিয়া আমরা রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম এবং আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে উঠিয়া শয়নের আয়োজন করিলাম। শুক্রবার কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলাম, মঙ্গলবার আগরা ত্যাগ করিলাম। আমার **দশদিনের** এক অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়া গেল।

কাশীর পথে

ইংরাজী মাসের বুধবার, যখন পড়িল, তখন আমরা তুণ্ডলা ষ্টেশনে। বর্দ্ধমানাধিপতি মহোদয় তাঁহার গাড়ীতে নিদ্রিত, আর আমরা সে রাত্রি নিদ্রা যাইব না বলিয়া একেবারে কৃতসঙ্কল্প! কখন শয়ন করিয়া, কখন বসিয়া, কখন বা ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমে পাইচারি করিয়া, এবং কথাটা গোপন করিবারও বিশেষ প্রয়োজন দেখি না, পাঁচ ছয়বার চায়ের শ্রাদ্ধ করিয়া আমরা কয়েকটী জীব রাত্রি-জাগরণ করিলাম।

আমরা যে গাড়ীতে উঠিব, তিনি শেষরাত্রিতে তুণ্ডলা ষ্টেশনে আগমন করেন; কিন্তু রেল কোম্পানী এমনই তৎপর যে, তাঁহারা রাত্রি দশটার পরেই আমাদিগকে সেই গাড়ীতে

তুলিয়া দিবার জন্য আগরা হইতে তণ্ডুলায় আনিয়া বসাইয়া রাখিলেন; ঐ সময়ের পর সারারাত্রির মধ্যে আগরা হইতে আসিবার আর গাড়ী নাই। ব্যবস্থা যে অতি সুন্দর, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অনুচরবর্গ সর্ব্বদা রেলে বেড়াইয়া একেবারে আটঘাট চিনিয়া লইয়াছেন; কোথায় কি করিতে হইবে, সব তাঁহারা জানেন। ডাক্তার বাবু ও সেক্রেটারী মহাশয় স্বাস্থ্যতত্ত্বের আদেশ সম্পূর্ণ অমান্য করিয়া সেই রাত্রি তিনটার সময় ষ্টেশনের স্নানাগারে প্রাতঃস্নান শেষ করিয়া লইলেন। চিত্রকর শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ হিন্দুস্থানী যুবক; স্নানাহারের অভাব তেমন গ্রাহ্যই করেন না; তিনি মহাজনগণের পন্থা অনুসরণ করিলেন না। আর আমি হিন্দুসন্তান;—কাশী যাইবার পথের মধ্যে রেলের স্নানাগারে স্নান করিয়া কি পরকালের পথরোধ করিব? তবে রাত্রিতে অর্থাৎ রাত্রি বারটার পর যে ক্রমাগত চা পান করিয়াছি, তাহাতে কোন দোষ হয় নাই এবং তাহাতে উপবাসও ভঙ্গ হয় নাই; কারণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ত আমাদের মতে পরদিন হয় না। ইংরাজের সবই তাড়াতাড়ি; তাই তাঁহারা রাত্রি বারটার পরই পরের দিন সুরু করিয়া দেন। আমরা ইংরাজের আইন সব স্থানে মানিয়া চলি; কিন্তু সুনিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া রাত্রি বারটার পর দিন বদলাই না; সুতরাং বুধবারের স্নানটা মঙ্গলবার রাত্রিতে করিয়া রাখা আমার পোষাইল

না। গমনসময়ে আমাদের আর একজন সঙ্গী ছিলেন শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয়। তিনি ফিরিবার সময় আমাদের সঙ্গী হইলেন না; তিনি না কি ধীরেসুস্থে মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তবে দেশে ফিরিবেন।

আমার দশদিনের ছুটী। তাহার পাঁচদিন পথে ও আগরায় কাটিয়া গেল; অবশিষ্ট পাঁচ দিন কাশীতে কাটাইবার ব্যবস্থা ছিল। বর্দ্ধমানের সবজজ্ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু দাদা মহাশয় তখন কাশীতে সপরিবারে পূজার ছুটী কাটাইতেছিলেন। অন্য সময়ে, সেই সেকালে যখন কাশীতে যাইতাম, তখন আশ্রয়-স্থান পূর্ব্বে স্থির করিতাম না; তখন যে আমার পূর্ব্বও ছিল না, পরও ছিল না,—ছিল একমাত্র বর্ত্তমান। তখন আমি কাশীতে পৌঁছিয়া একেবারে কাশীশ্বর দেবাদিদেব বিশ্বনাথের শরণ লইতাম;—তখন বিশ্বনাথের আতিথ্যই গ্রহণ করিতাম; তিনিই আহার দিতেন, আশ্রয় দিতেন,—আমাকে কিছু ভাবিতে হইত না। এখন যতই বেলা পড়িতেছে, ততই 'আমি'টা মাথা তুলিতেছে; এখন বিশ্বনাথের আশ্রয় গ্রহণ করা আর হয় না,—এখন নরনাথ খুঁজি। হায় অধঃপতন!

সে কথা থাকুক। আগরায় পৌঁছিবার পরের দিনই শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আদেশ করিলেন যে, আমি সেইদিনই কাশীতে দেবেন্দ্র দাদাকে যেন সংবাদ পাঠাই যে, আমি বুধবারে কাশীতে যাইব; তিনি যেন আমাকে লইয়া যাইবার জন্য মোগল-

সরাই ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দেন। যাহাতে 'তার'-যোগে তাঁহার উত্তর পাওয়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। যথাসময়ে 'তারে'ই উত্তর আসিল—'হঁা তাহাই হইবে'। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইলেন না; তিনি বলিলেন "মোগলসরাই ষ্টেশনে যদি লোক না আসে, তাহা হইলে আপনাকে একেলা নামিতে দিব না, আপনাকে কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইবে।" হায় মহারাজ, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন? তখন যে আমার এক বিশ্বনাথ ছাড়া কেহই ছিলেন না; তখন আমার মুখের দিকে চাহিবার লোক ত ছিল না; তখন ত একেলাই কত দেশ-বিদেশ, কত পাহাড়-পর্ব্বত ঘুরিয়াছি। আর এখন বর্দ্ধমানাধিপতি আমাকে একেলা কাশী যাইতেও দিতে চাহেন না। বৃদ্ধ বয়সে আমি নাবালক হইয়া পড়িয়াছি। সে কথাও বলি; এখন ত আর সে নির্ভরের ভাব নাই; এখন যে লোটাকম্বল খসিয়া পড়িয়াছে; এখন যে প্রাতঃকালে উঠিয়া চা-পান করিতে হয়; এখন যে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে আহার না করিলে পেট জ্বলিয়া যায়; এখন যে একটু অনিয়ম হইলে মাথা ধরে, জ্বর হয়; এখন যে গুরুভোজন সয় না। হা অদৃষ্ট, ভিক্ষালব্ধ পাহাড়ী রুটিতে যাহার দিন কাটিয়াছে; আধসের তিনপোয়া মোটা চাউল যে সিদ্ধ না করিয়া চর্ব্বণেই উদরস্থ করিয়া এক গণ্ডুষ জলপান করিয়া মহাতৃপ্তি অনুভব করিয়াছে; দুইতিনদিনের অনাহারে

যাহাকে ক্লান্ত করিতে পারে নাই; দুরারোহ পর্ব্বতের দশ-বারো মাইল চড়াই যে হাসিতে-হাসিতে অতিক্রম করিয়াছে;—
—সে আর এখন নাই! তাই মহারাজাধিরাজের এত সাবধানতা। সে শক্তি-সামর্থ্য নাই; সে সংযম নাই; সে নির্ভরশীলতা নাই; সে উৎসাহ নাই;—সে সকল কিছুই নাই। তাই মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহার এই সঙ্গীটীর পরিচর্য্যার জন্য একদল ভৃত্য নিযুক্ত করেন; ঘণ্টায় পাঁচবার খোঁজ নেন— আমি কেমন আছি; তাই আজ তিনি এই দুর্ব্বল বৃদ্ধ শিশুটীকে বিনা সঙ্গীতে কাশী যাইতে দিতে চান না। তিনি বুঝিয়াছেন, বৃদ্ধের এখন অবলম্বন-যষ্টি চাই। তাহাই হউক!

অপরাহ্নকালে আমাদের গাড়ী মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিল। মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহে আগরায় আমার লগেজ যথেষ্ট বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল। এত সব লইয়া কাশীগমন হইতে পারে না— পাপের বোঝাই যে প্রকাণ্ড! বন্ধুগণ আমার বোঝা বহিতে স্বীকৃত হইলেন; তাঁহারা আমার লগেজগুলি কলিকাতায় আমার বাসায় পৌঁছাইয়া দিবেন বলিলেন। বিছানা ও ব্যাগটীও তাঁহাদের সঙ্গে দিতে চাহিলাম; কিন্তু তাঁহারা সে দুইটি দ্রব্য লইয়া যাইতে চাহিলেন না; সুতরাং তাহাদেরও কাশীদর্শনই স্থির হইল।

মোগলসরাই ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে দেখা গেল যে, পূজনীয় দেবেন্দ্র দাদা একটী লোক পাঠান নাই—এক রেজিমেণ্ট পাঠাইয়া-

ছেন। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র আমাকে কাশী লইয়া যাইবার জন্য এত লোক! আমি একেবারে এতটুকু হইয়া গেলাম। দেবেন্দ্র দাদার পাঁচটী পুত্র; সে পাঁচজনই ষ্টেশনে আসিয়াছেন; তাঁহার শিশু পৌত্রটিকে যে ষ্টেশনে পাঠান নাই, ইহাই রক্ষা! তাহার পর ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন বর্দ্ধমানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ নবীন উকীল, আমার পরম স্নেহভাজন মন্মথকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল। কিন্তু হায়, মন্মথকুমার আর ইহজগতে নাই; কাশীতেই তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ! কাশী হইতে বর্দ্ধমানে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই তিনদিনের জ্বরে নবীন যৌবনে মন্মথকুমার সকল মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা, তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারের কথা মনে হইলে এখনও চক্ষে জল আসে। তাহার পর ষ্টেশনে দেখিলাম আমাদের সেই বর্দ্ধমান-সম্মিলনের স্বেচ্ছা-সেবকগণের অধিনায়ক, বর্দ্ধমান কলেজের অধ্যাপক, আমাদের মন্মথকুমারেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ গিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল। এতদ্ব্যতীত আরও সাত-আটটি যুবক আমাকে কাশীতে লইয়া যাইবার জন্য মোগলসরাই ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি ত অবাক্। আমার জন্য এত আগ্রহ কেন? এ যে বিপুল অভ্যর্থনা! আমি ত ইহার যোগ্য নহি। নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া কুণ্ঠিত হইলাম; কিন্তু

দেবেন্দ্র দাদার অপার স্নেহের কথা, তাঁহার পুত্রগণের ও মন্মথ গিরীন্দ্রের শ্রদ্ধার কথা মনে করিয়া হৃদয়ে বল পাইলাম। মনে হইল, আমি এমন কি মানুষ যে, আমার উপর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের স্নেহ-অনুগ্রহ অবিরাম বর্ষিত হইতেছে; দেবেন্দ্র দাদার স্নেহ আমাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য সদা অগ্রসর; আর এই যুবকবৃন্দ আমাকে এই শ্রদ্ধাভক্তি করেন। এত স্নেহ, এত অনুগ্রহ লাভ করিবার উপযুক্ত হওয়া যায় কেমন করিয়া। এই বৃদ্ধ বয়সে এক-একবার মনে হইল, উপযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিলে হয় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে নববলের সঞ্চার হয়, নিজেকে যোগ্য করিবার বাসনা প্রবল হয়।

সে কথা এখন থাকুক। এই রেজিমেণ্টের কেহ আমার বিছানা অধিকার করিলেন, কেহ ব্যাগটা নামাইয়া লইলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া মহারাজাধিরাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। মহারাজও এই রেজিমেণ্ট দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার পর আমাকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "তোমরা না আসিলে আমি ওঁকে একেলা যাইতে দিতাম না।" আমাকে বলিলেন, দেবেন্দ্র দাদাকে পাইয়া যেন ঘরের কথা ভুলিয়া না যাই। আমি অবনতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। কোথাকার কে আমি! এই নগণ্য ব্যক্তির জন্য মহারাজাধিরাজের হৃদয়ে এত অনুগ্রহ, এত স্নেহ!

দশমদিন

মহারাজাধিরাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি আমার পাঁচদিনের দিনরাতের সঙ্গীদিগের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা সকলেই গাড়ীর সম্মুখে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া ছিলেন। নন্দলাল, ললিত, রামেশ্বরপ্রসাদের নিকট বিদায়-গ্রহণ করিলাম। তাঁহারা বড়ই বিমর্ষ; বিদায় যেন তাঁহারা দিতে চান না। কিন্তু তাহা কি এ জগতে হয় ভাই! কে কাহাকে কবে স্নেহের বন্ধনে, বাহুপাশে আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে? যেতে দিতেই হয়! কত স্নেহের ধন, আনন্দদুলালদুলালীকে হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিয়া, হাহাকারে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া চিরদিনের জন্য যাইতে হইয়াছে! এ ত পাঁচদিনের জন্য বিদায়! অত কথা বলিবার তখন সময় ছিল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল; বন্ধুগণ গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া মুখ বাড়াইয়া বিদায়-অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। মহারাজাধিরাজের গাড়ী-খানি যখন আমাদের সম্মুখ দিয়া গেল, তখন তিনিও হাত নাড়িয়া আমাদের সম্ভাষণ করিলেন। পঞ্জাবমেল কলিকাতার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। আমরা ষ্টেশনের অপরপার্শ্বে দণ্ডায়-মান কাশী-গমনোন্মুখ গাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। সঙ্গীদিগের হাস্য-তরঙ্গে, আমোদ-আনন্দে গাড়ীখানি মুখর হইয়া উঠিল। একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমরা কাশীযাত্রা করিলাম।